ECL

# মৃদঙ্গার

রাজভাষা বিভাগের বাংলা পত্রিকা

পত্রিকা সংখ্যা - ৭, বছর - ২০২৫-২৬

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा

श्रीमद्भागवत्गीता (अध्याय-१५, श्लोक-१३)

## ইস্টার্ন কোলফিল্ডস্ লিমিটেড

(কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড-এর একটি অনুসঙ্গী কোম্পানি)

সাঁকতোড়িয়া, পোষ্ট ঃ ডিসেরগড়, জেলা ঃ পশ্চিম বর্ধমান (পঃ বঃ), পিন-৭১৩৩৩৩

ইস্টার্ন কোলফিল্ডস্ লিমিটেড-এর
ঘরোয়া সাহিত্য পত্রিকা

# মৃদঙ্গার

পত্রিকা সংখ্যা - ৭, বছর - ২০২৫-২৬

## মৃদঙ্গার পরিচালক মণ্ডলী

**প্রধান উপদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক :**
সতীশ ঝা
অধ্যক্ষ তথা পরিচালন অধিকর্তা, ইসিএল

**পৃষ্ঠপোষক ঃ**
মো. আনজার আলম
নিদেশক (বিত্ত), ইসিএল

নীলাদ্রি রায়
নিদেশক (প্রযুক্তি) সঞ্চালন

গিরিশ গোপীনাথন নায়ার
নিদেশক (প্রযুক্তি) যোজনা ও পরিযোজনা

দীপ্তি পটেল
মুখ্য সতর্কতা অধিকারী

প্রধান সম্পাদক
গুঞ্জন কুমার সিনহা
নিদেশক (মানব সংসাধন), ইসিএল

**সম্পাদক :**
নমিতা মাঝি সরেন
রাজভাষা বিভাগ

**সহ-সম্পাদক :**
ববিতা মাহাতা
নিদেশক (তকনিকী) যোজনা এবং পরিযোজনা

**প্রচ্ছদ :**
শ্রীমতী কিরণ ঝা
অধ্যক্ষ, শতাক্ষী মহিলা মণ্ডল

সম্পাদকীয় কার্যালয় :
ইস্টার্ন কোলফিল্ডস্ লিমিটেড,
অধ্যক্ষ তথা পরিচালন অধিকর্তার কার্যালয়,
রাজভাষা বিভাগ, সাঁকতোড়িয়া,
পোষ্ট - ডিসেরগড়, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান,
রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩৩৩৩

## সূচীপত্র

ECL

| লেখা | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ভবিষ্যতের উড়ানে ডানা তৈরি করা - কাস্তা ওয়েস্ট কয়লা ব্লক | সতীশ ঝা | ১ |
| অধিকার এমনই যে অধিকার পরিশোধ করা হয়নি | মো. আনজার আলম | ৪ |
| খনি সম্বরণ পরিকল্পনা | নীলাদ্রি রায় | ৬ |
| ভাষা এবং প্রযুক্তি | গুঞ্জন কুমার সিনহা | ৯ |
| জনসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ সম্মিলিত দায়বদ্ধতা | গিরিশ গোপীনাথন নায়ার | ১১ |
| কর্তব্য এবং সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা | দীপ্তি পটেল | ১২ |
| আদিবাসী সাঁওতাল সমাজের বিকাশে নারীর ভূমিকা | নমিতা মাঝি সরেন | ১৪ |
| আমি | শিপ্রা দাসগুপ্ত | ১৫ |
| ক্রমশ এগিয়ে | শম্ভুনাথ পাল | ১৫ |
| উত্তরাধিকারী | সুকুমার পাল | ১৬ |
| একই রকম | রঞ্জীত কুমার (আকেলা ভাটকেল ) | ২১ |
| কবি স্মরণে | জয়ন্তিকা গড়াই | ২২ |
| তাকিয়ে আছি | নিবেদিতা দেওঘরিয়া | ২৩ |
| নারী | বিশ্বরঞ্জন সরকার | ২৪ |
| মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন | বিশ্বরঞ্জন সরকার | ২৪ |
| নিরুত্তর | রাজেন সাধু | ২৫ |
| আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস উদযাপন | | ২৬ |
| আমার কুম্ভ স্নান | সুদীপ চ্যাটার্জী | ২৮ |
| পুণ্যভূমি কামারপুকুর জয়রামবাটী | স্বপন কুমার দাস | ২৯ |
| বিকেলের পরাশকোল আবাসন | অমলা দাস | ৩১ |
| সময় | দেবব্রত মালাকার (দেবু) | ৩২ |
| মাধুরীর স্মৃতিতে | মানিক লাল আচার্য | ৩২ |
| বিদায় | দিলীপ কুমার আচার্য্য | ৩৩ |
| রস চুরি | ডাঃ প্রকাশ হালদার | ৩৪ |
| সাঁঝের কানাই | শ্রীঅচিন্ত্য সেনগুপ্ত | ৩৮ |
| হৃদয় ভরা সোনা | পার্থ চৌধুরী | ৩৯ |
| চিত্রকলা | মান্যতা মণ্ডল, লগ্নজিতা শর্মা | ৪০ |
| চিত্রকলা | অহনা রায়, শ্রেয়া সিং | ৪১ |

*দাবিত্যাগ ঃ মৃদঙ্গার-এ প্রকাশিত রচনাগুলি লেখকের একান্ত নিজস্ব এবং রচনার মৌলিকত্বের দায়ভার সম্পূর্ণভাবে লেখকের। মৃদঙ্গার সম্পাদকমণ্ডলী, রাজভাষা বিভাগ এবং সর্বোপরি ই.সি.এল. কর্তৃপক্ষ-এ বিষয়ক সমস্ত দাবী অস্বীকার করে।*

প্রধান উপদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক

# ভবিষ্যতের উড়ানে ডানা তৈরি করা - কাস্তা ওয়েস্ট কয়লা ব্লক

এই নিরন্তর পরিবর্তনশীল বিশ্বে, শক্তির ব্যবহার এবং সরবরাহে সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। একইসঙ্গে সমগ্র মানবজাতি নতুন নতুন উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের মাধ্যমে অনেক সুনির্দিষ্ট ফলাফল অর্জনের জন্য প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কোথাও সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি ইত্যাদির মতো পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদ নিয়ে নিবিড় গবেষণা করা হচ্ছে, কোথাও প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে বিকশিত এবং রূপান্তরের চেষ্টা করা হচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায় প্রচলিত খনি প্রযুক্তির পাশাপাশি ভূগর্ভস্থ কোল গ্যাসিফিকেশন টেকনোলজি (ইউসিজি) নিয়ে কাজ করছে ইসিএল। এটাই কোম্পানির ভবিষ্যৎ। দেশের ক্রমবর্ধমান শক্তির চাহিদা পূরণের এটি একটি নতুন রূপ। এটি পরিচ্ছন্ন শক্তির প্রতীক যা মানবজাতির জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ। আসুন জেনে নেওয়া যাক এই প্রযুক্তি সম্পর্কে, এটি কী, এর উপকারিতা কী, এর মধ্যে কী কী চ্যালেঞ্জ রয়েছে এবং এর সমাধান কী হবে।

ভূগর্ভস্থ কয়লা গ্যাসিফিকেশন, (যা ইন-সিটু) গ্যাসিফিকেশন নামেও পরিচিত, একটি উন্নত কৌশল যেখানে মাটির গভীরে কয়লার স্তরের মধ্যে গ্যাসিফিকেশন প্রক্রিয়া সঞ্চালিত হয়। এখানে কয়লা উত্তোলন এবং এটি পৃষ্ঠে আনার পরিবর্তে, কয়লা স্তরে কূপগুলি খনন করা হয়। কয়লাকে জ্বালিয়ে এবং গ্যাসিফাই করার জন্য একটি নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় অক্সিজেন এবং বাষ্প প্রেরণ করা হয়, যা কয়লার স্তর গুলিকে সিন্থেটিক গ্যাস বা সিনগ্যাসে রূপান্তরিত করে এবং তারপরে অন্য একটি কূপের মাধ্যমে বার করা হয়। রূপান্তরিত সিনগ্যাস প্রধানত কার্বন মনোক্সাইড (CO), হাইড্রোজেন ($H_2$), কার্বন ডাই অক্সাইড ($CO_2$), মিথেন ($CH_4$) এবং জলীয় বাষ্প ($H_2O$), নাইট্রোজেন ($N_2$) দ্বারা গঠিত।

এর প্রয়োগ গ্যাস টারবাইন বা সম্মিলিত চক্রীয় প্ল্যান্টগুলিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন; রাসায়নিক ফিডস্টক যেমন মিথানল, অ্যামোনিয়া, সিন্থেটিক প্রাকৃতিক গ্যাস (SNG) সার (Fertilizer) এবং হাইড্রোজেন ইত্যাদি উৎপাদিত হয়।

এই প্রযুক্তিটি রাষ্ট্রের স্বার্থে, এটি ৩০০ মিটারেরও বেশি গভীরতার অ-খননযোগ্য মজুত কয়লাকে ব্যবহারের উপযুক্ত করে। প্রথাগত খনির তুলনায় ভূপৃষ্ঠের ক্ষতি হ্রাস করে। কয়লা পরিবহণ এবং হ্যান্ডলিংয়ের প্রয়োজনীয়তা দূর করে কার্বন ফুটপ্রিন্ট হ্রাস করে। ফলে এই প্রযুক্তি যুব সাশ্রয়কারী, একইসঙ্গে, এটি শক্তি নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে এবং অপরিশোধিত তেল এবং পেট্রোকেমিক্যাল আমদানির উপর ভারতের নির্ভরতা হ্রাস করে। গ্যাসিফিকেশন এর মাধ্যমে আমরা শক্তির জন্য বৈদেশিক ঋণ কমাতে পারবো।

## অনুপ্রেরণা ও দিকনির্দেশনা

ইউসিজি-তে ভারতের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বেশ কিছুদিন ধরেই অনুভূত হয়েছে। এই সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে ভারত সরকারের রাষ্ট্রীয় গ্রিন হাইড্রোজেন মিশন ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে চালু করা

হয়েছিল। ভারতকে গ্রিন হাইড্রোজেনের উৎপাদন, ব্যবহার এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে একটি গ্লোবাল হাব হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই মিশন চালু করা হয়েছিল। ২০৩০ সালের মধ্যে, এটি বার্ষিক উৎপাদনের ৫ এমএমটি, ১২৫ গিগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষমতা সংযোজন এবং মোট ৮ লক্ষ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগের লক্ষ্য নিয়েছে, যা প্রায় ৬ লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি করবে এবং জীবাশ্ম জ্বালানী আমদানি হ্রাস করবে।

এই মিশনের মূল উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেক্ট্রোলাইজারের দেশীয় উৎপাদন এবং গ্রিন হাইড্রোজেন উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া; জাহাজ চলাচল, বিমান চলাচল এবং ইস্পাতের মতো উদীয়মান শেষ ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলিতে সহায়তার জন্য পাইলট প্রকল্প, ব্যাপক উৎপাদন ব্যবহারে সহায়তা করার জন্য সক্ষম ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা এবং উন্নয়ন, পরিবেশ বান্ধব হাইড্রোজেন হাব তৈরি করা এবং দক্ষতা ও ব্যয় সাশ্রয়ের জন্য গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা।

## রেজোলিউশন সহ বাস্তবায়ন

ভারত সরকারের অনুপ্রেরণায় কয়লা মন্ত্রক রাষ্ট্রীয় কয়লা গ্যাসিফিকেশন মিশন চালু করেছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০ মিলিয়ন টন কয়লা উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির হয়েছে। আমরা কয়লা থেকে গ্যাস উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির করেছি। এজন্য ঝাড়খন্ডের জামতাড়া জেলার নালা ব্লকে অবস্থিত কাস্তা কয়লা ব্লককে ভারতের ভূতাত্ত্বিক কনফিগারেশনে এই প্রথম পাইলট ইউসিজি প্রকল্পের রূপায়ণ কেন্দ্র হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে এই মহান কাজের সমাপ্তির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ইসিএলকে। ব্লকটি অবকাঠামোর সাথে ভালভাবে সংযুক্ত এবং অজয় নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত ।

পাইলট প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল ভারতীয় ভূ-খনির পরিস্থিতিতে ইউসিজিগুলির জন্য ধারণার প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করা; সিনগ্যাস উৎপাদনের গুণমান, পরিমাণ ও সম্ভাব্যতা, সুরক্ষা, পরিবেশগত প্রভাব অধ্যয়ন করা এবং বড় আকারের বাণিজ্যিক ইউসিজির জন্য দেশীয় প্রযুক্তি বিকাশ করা। প্রকল্পের ভূতাত্ত্বিক এবং জলবিদ্যুৎ বিবরণ নিম্নরূপ

- নির্ধারিত কয়লা স্তর - বরাকার প্রস্তর গ্রুপের বি-VI সিম
- গভীরতা - মাটি স্তর থেকে ২৫০ থেকে ৩০৫ মিটার নীচে
- কয়লার গুণমান - নন-কোকিং, জি ৬ - জি ১১ গ্রেড কয়লা (গ্যাসিফিকেশনের জন্য উপযুক্ত)
- অধিভার - আরকিউডি ৭০% - ৯০% সহ শক্ত এবং কমপ্যাক্ট বেলেপাথর, কাঠামোগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে।
- হাইড্রোজিওলজি - কোনও বড় ভূগর্ভস্থ জল স্তর (aquifers) পাওয়া যায়নি। ভূগর্ভস্থ জলের মডেলিং কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবেশগত ঝুঁকি নির্দেশ করে না।
- অবনতি / ধস - শিলা যান্ত্রিক (Rock Mechanics) সমীক্ষা নগণ্য ভূপৃষ্ঠ অবনমন নিশ্চিত করেছে ।

ইসিএল কাস্তা ওয়েস্ট কয়লা ব্লকে প্রথম পর্যায়ে ভারতের প্রথম ভূগর্ভস্থ কয়লা গ্যাসিফিকেশন পাইলট প্রকল্পের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনকে উৎসাহিত ও টেকসই করতে সাহায্য করেছে । এটি একটি যুগান্তকারী প্রকল্প যা কানাডার এরগো Ergo Exergy Technologies Inc. (EETI) এক্সারজি টেকনোলজিস ইনকর্পোরেটেড (ইইটিআই) এবং সিএমপিডিআই, রাঁচির সহযোগিতায় সম্পাদিত হচ্ছে । এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের উৎসাহব্যঞ্জক পরিণামের পর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে যা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে শেষ করা হবে।

কাস্তা ওয়েস্ট ইউসিজি পাইলট প্রকল্পটি ভারতীয় শক্তি ক্ষেত্রের জন্য একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ, যা উদ্ভাবনী, পরিচ্ছন্ন কয়লা প্রযুক্তির দিকে পরিবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করে। সফলভাবে এই প্রকল্প রূপায়ণের ফলে ভারত বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। প্রকল্পটি ভবিষ্যতের বাণিজ্যিক-স্কেল ইউসিজি ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে, শক্তি সুরক্ষা, শিল্প ফিডস্টক স্বনির্ভরতা এবং কম কার্বন বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

পরিশেষে, আমি এটি বলতে চাই -

**উর্জাপূর্ণম্ জগত্ সর্বম্ প্রাণিনম্ সংজীবম্ চ**
**সমগ্র পৃথিবী শক্তিতে পূর্ণ এবং এটি সমস্ত জীবকে পুষ্ট করে।**

**সতীশ ঝা**
অধ্যক্ষ তথা পরিচালন অধিকর্তা
ইস্টার্ন কোলফিল্ডস্ লিমিটেড

পৃষ্ঠপোষক

# অধিকার এমনই যে অধিকার পরিশোধ করা হয়নি

ভারত একটি বহুমাত্রিক বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ দেশ এবং তার বৈচিত্র্যের জন্য আমরা গর্বিত। এই বৈচিত্রগুলি যেমন ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক, তেমনি তা ভাষাগত। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে, ভারতে ১২১ টি প্রধান ভাষা এবং ২৭০ টিরও বেশি মাতৃভাষায় কথা বলা হয়। ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফসিলে ২২ টি প্রধান ভাষা রয়েছে। সমৃদ্ধ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক রচনা এই ভাষাগুলির বেশিরভাগেই পাওয়া যায়। যা তাদের গৌরবময় ইতিহাসের সাক্ষী। এই সমৃদ্ধ ভাষা এবং তাদের সমৃদ্ধ ইতিহাসের মধ্যে, জাতীয় ভাষা এবং সরকারী ভাষা হিসাবে যে কোনও একটি ভাষাকে বেছে নেওয়া জাতির প্রতিষ্ঠাতাদের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ ছিল। যেহেতু হিন্দি জাতীয় আন্দোলনে মত প্রকাশ ও যোগাযোগের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে জাতীয় ভাষা ও সরকারি ভাষার মর্যাদার জন্য একটি শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে উপস্থিত ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ই হিন্দির একটি জাতীয় রূপ বিকশিত হয়েছিল এবং সেই সংগ্রামের সময়ই হিন্দি সেই গৌরব অর্জন করেছিল যা একটি ভাষাকে জাতীয় ভাষা করে তুলেছিল।

আজ যে  হিন্দি নিয়ে এত আলোচনা হয়,তার রাজভাষা  হয়ে ওঠার যাত্রা এত সহজ ছিল না। সাহিত্য ও ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে সামান্যতম সচেতন যে কেউ খুব ভালো করেই জানেন যে হিন্দির এ পর্যন্ত যাত্রা চ্যালেঞ্জ এবং সংগ্রামের যাত্রা। হিন্দি ও ফারসি ভাষার মধ্যে বিতর্ক এবং তারপর হিন্দিকে নতুন ছন্দে রূপান্তরিত করা এবং তারপরে হিন্দি ও ইংরেজির বিতর্ক এখন কমবেশি এমনই। দেশের অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার সামনে হিন্দিকে আলাদা করার চেষ্টা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। আমি এই সত্যের প্রবল সমর্থক যে হিন্দির অত্যধিক ব্যবহারের সাথে অন্যান্য ভাষার দুর্বলতা বা হীনমন্যতার কোনও সম্পর্ক নেই। প্রকৃতপক্ষে, অন্যান্য সমস্ত আঞ্চলিক ভাষা হিন্দির সাথে সহধর্মী হয়ে তাদের ঐতিহাসিক অবদান রেখে চলেছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

স্বাধীনতার পর থেকে সরকারি কাজে সরকারি ভাষা হিন্দির সর্বাধিক ব্যবহারের জন্য অনুচ্ছেদ ৩৪৩ থেকে ৩৫১-এ বিধান রাখা হয়েছে। এবং এই চেষ্টা করা হয়েছে যে স্বাধীন ভারতে সরকারী কাজে হিন্দি গ্রহণ করা হবে এবং সমস্ত অফিস স্বেচ্ছায় হিন্দিতে তাদের দৈনন্দিন কাজ শুরু করবে। কিন্তু পরিসংখ্যান বিস্ময়কর এবং স্বাধীনতার এত বছর পরেও হিন্দির ব্যবহার সরকারি প্রচেষ্টা এবং আদেশের উপর নির্ভরশীল । এমন নয় যে এই বছরগুলিতে হিন্দির বিকাশের জন্য কোনও কাজ বা  প্রচেষ্টা করা হয়নি, কিন্তু যে গতি এবং উৎসাহ নিয়ে এটি করার কথা ছিল তা এখনও প্রয়োজন। ভারতেন্দু হরিশচন্দ্র, যিনি একসময় হিন্দি গদ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, তাঁর ভাষার গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে বলেছিলেন ।

নিজের ভাষাই সকল অগ্রগতির মূল
নিজের ভাষার জ্ঞান ছাড়া হৃদয়ের যন্ত্রণা মুছে ফেলা যায় না।

আমাদের জীবন এবং অফিসের কাজেও এই নীতিবাক্য অনুসরণ করতে হবে, তবেই আমরা হিন্দিকে যথাযথ

মর্যাদা এবং স্থান দিতে পারব । অনেক সময় বা কখনও কখনও মনে হয় যে হিন্দিতে কাজ করা ততটা কঠিন নয় যতটা আমরা ভাবি বরং অনেক ক্ষেত্রে এটি আমাদের বেশিরভাগই অতীতের ঐতিহ্যে কাজ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং এর মধ্যে সামান্যতম নতুনত্ব আমাদের বিরক্ত করে। তবে পৃথিবীর সৌন্দর্য তাদের কাছ থেকে যারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নতুন কিছু সৃষ্টি করেছেন। সম্প্রতি সরকারি ভাষা সংক্রান্ত সংসদীয় রাজভাষা সমিতি পূর্বভারতের অংশ পরিদর্শন সম্পন্ন করেছে এবং এর পরিপেক্ষিতে সমস্ত কার্যালয়ে ইসিএলের পারফরম্যান্স তুলনামূলকভাবে ভালো হয়েছে। ইসিএল-এর হিন্দি ভাষা আরও বেশি করে ব্যবহার করার নিরন্তর প্রচেষ্টা উপরোক্ত সাফল্যের গল্প বলে। আর একটু বেশি প্রচেষ্টা করলেই আমরা এতে গুণগত পরিবর্তন আনতে পারি এবং অন্যদের জন্য উদাহরণ হয়ে উঠতে পারি। বার্ষিক প্রতিবেদন, ম্যাগাজিন এবং বিজ্ঞাপনগুলিও এই লক্ষ্য পূরণে অর্থবহ প্রয়াস চালিয়েছে এবং আরও বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে হিন্দি পৌঁছানো নিশ্চিত করা হয়েছে। সেমিনার ও কর্মশালা নিয়মিত পরিচালনার ফলে প্রচুর প্রশিক্ষিত কর্মী বাহিনী তৈরি হয়েছে, যার ফলাফল আগামী দিনগুলিতে প্রতিফলিত হবে। হিন্দি সম্পর্কিত কর্মসূচিতে তরুণ কর্মীদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ একটি ইতিবাচক দিক এবং উৎসাহব্যঞ্জক লক্ষণ।

এই সাফল্যের মধ্য দিয়ে চ্যালেঞ্জও কম নয়। এই চ্যালেঞ্জগুলির পাশাপাশি, আরও ভাল সমন্বয় ভবিষ্যতের পথ প্রশস্ত করবে। অফিসে দীর্ঘদিন ধরে ইংরেজির আধিপত্য রয়েছে এবং এর কারণে টেকনিক্যাল ও সফটওয়্যার টুলস এর পক্ষে বেশি অনুকূল হয়ে পড়েছে, যার কারণে হিন্দিতে কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ে, পাশাপাশি ইংরেজির কার্যকারিতা ও পেশাদারিত্বের প্রতি অত্যধিক মুগ্ধতাও বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ইংরেজিতে প্রযুক্তিগত এবং বৈজ্ঞানিক শব্দগুলির প্রবাহ সহজ এবং অন্যদিকে হিন্দিতে প্রমিত ফর্মের অভাব রয়েছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, সহজতর ও ব্যবহারিক কারিগরি পরিভাষা এবং দ্বিভাষিক কর্মসংস্কৃতি প্রচারের মাধ্যমে এ লক্ষ্যে আরও ভালো ফলাফল অর্জন করা যেতে পারে।

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে হিন্দির কার্যকরী ব্যবহার কেবল একটি ভাষাগত প্রশ্ন নয়, বরং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং সুশাসনের মৌলিক ধারণার একটি যৌগিক লক্ষ্য। নিরন্তর প্রচেষ্টা এবং বাস্তবমুখী নীতির মাধ্যমে আমরা এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারি এবং ভাষার প্রতি আমাদের জাতীয় কর্তব্যও পালন করতে পারি। বাকুল গালিব -

**"এটি তার জীবন ছিল যা দেওয়া হয়েছিল**
**অধিকার এমনই যে অধিকার পরিশোধ করা হয়নি।"**

**মো. আনজার আলম**
নিদেশক (বিত্ত), ইসিএল

পৃষ্ঠপোষক

# খনি সম্বরণ পরিকল্পনা
## (Mine Closure Plan)

ইংরেজিতে একটি শব্দ আছে ক্লোজার (Closure) যার অর্থ সাধারণত বন্ধ করা, কিন্তু বন্ধ করা বলতে আমরা কী বুঝি, তা নির্ভর করে দেশ, সময় এবং ব্যাক্তিভেদ প্রকারের উপর। আর্থিক পরিস্থিতি (Financial Closure) মানে আর্থিক পূর্ণতা। কয়লা শিল্পে খনি বন্ধ হওয়ার একটি ভিন্ন অর্থ হল যে এটি কেবল বন্ধ করা নয়, জনগণের কল্যাণের জন্য বিদ্যমান খনিটি পরিচালনা করার পাশাপাশি খনির কার্যক্রমকে ক্রমাগত পুনরুজ্জীবিত করে খনি কার্যক্রম বন্ধ করা যাতে খননের পরেও জমিটি জনসাধারণের উপযোগিতা সাধন করিতে পারে। এখন, সাজসজ্জা বলতে আমরা কি বুঝি, এটা মহিলাদের একটি গুণ রয়েছে অলঙ্করণ। এই যৌগিক শব্দটির সাথে, আমরা সম্পূর্ণ অর্থের একটি ধারণা পাই। সংস্কৃতে 'সম্বরণ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

**ভূমিকা ঃ-**

খনি সম্বরণ পরিকল্পনা (Mine Closure Plan) একটি খনির পরিকল্পনার বিধিবদ্ধ উপাদান যা বৈজ্ঞানিক পুনরুদ্ধার, পরিবেশগত পুনরুদ্ধার এবং খনি এলাকার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নির্ধারণ করে, এটি নিশ্চিত করে যে জমিটি ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য পুনরুদ্ধার করা হয় বা এর পরিবেশগত অবস্থার উন্নতি হয়। খনি এলাকাগুলির বৈজ্ঞানিক পুনর্বাসন ও পুনর্বাসন, পরিবেশের অবক্ষয় হ্রাস, জনস্বাস্থ্য রক্ষা এবং ভবিষ্যতের ব্যবহারের উপযোগী অবস্থায় জমি স্থাপন বা প্রায় প্রাকৃতিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের প্রচারের জন্য নির্দেশিকা অনুসারে নিয়মিত খনি সম্বরণ কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।

খনি সম্বরণ পরিকল্পনার প্রধান উপাদানগুলি ঃ-

খনি সম্বরণ পরিকল্পনায় দুটি প্রধান অংশ রয়েছে ঃ-

১. **প্রগতিশীল খনি সম্বরণ পরিকল্পনা (Progressive Mine Closure Plan)** - খনি কার্যক্রমের পুরো সময়কালে বিভিন্ন ভূমি ব্যবহারের কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে এবং ক্রমানুসারে পরিচালিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, খনির সময়কাল জুড়ে ব্যাকফিলিং, পুনরুদ্ধার, পুনরায় রোপণ এবং পরিবেশগত সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

২. **চূড়ান্ত খনি সম্বরণ পরিকল্পনা (Final Mine Closure Plan)** - খনি সক্রিয়করণের শেষে কার্যক্রম শুরু হয় এবং মজুদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও এবং / অথবা খনি বন্ধ হওয়ার পরেও অব্যাহত থাকতে পারে। যেমন, অবকাঠামো অপসারণ (Dismantling), দক্ষতা উন্নয়ন (Skilling), পরিবেশ পর্যবেক্ষন (Environmental Monitoring) ইত্যাদি।

### পটভূমি ঃ-

২০০৯ সালের সেপ্টেম্বরে সংশোধিত, নির্দেশ অনুয়ায়ী ২৯.০৫.২০২০ তারিখে এ মন্ত্রালয় খনি সম্বরণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করার প্রাথমিক আদেশ জারি করেছিল। এই নির্দেশিকাগুলি কেবল ভৌত এবং পরিবেশগত দিকগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। ২০০৯ সালে নির্দেশিকার আগে, পরিত্যক্ত বা ধারাবাহিক খনিগুলি বন্ধ করার জন্য খনি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০২২ জারি করা হয়েছিল। নতুন খনি সম্বরণ নির্দেশিকা ২০২৫ পুনরুদ্ধার করা জমিতে নতুন জীবিকার সুযোগ তৈরি এবং সম্প্রদায় বিকাশের জন্য কৃষি, সৌর শক্তি, ইকো-ট্যুরিজমের (eco-tourism) মতো উৎপাদনশীল বাস্তুতন্ত্রের রূপান্তর বাধ্যতামূলক করে।

### লক্ষ্য ঃ-

নির্দেশিকায় জোর দেওয়া হয়েছে যে গ্রুমিং পরিকল্পনাটি একটি বৈজ্ঞানিক, নিয়মতান্ত্রিক এবং ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হওয়া উচিত যা নিশ্চিত করে

- ভূমি, জল, বায়ু ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ
- ল্যান্ডস্কেপ ব্যাঘাত হ্রাস করা
- স্থানীয় সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা
- ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় জমি ফিরিয়ে আনা (যেমন কৃষি, বনায়ন, জলজ চাষ, বিনোদনমূলক ব্যবহার)
- নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা কাঠামো

খনি মালিকের সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসাবে ভূমিকে তার নিকট প্রাকৃতিক অবস্থা বা উন্নতর ভূমি মূল্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব সমূহ যথাযথ ভাবে পালন করা।

### খনি সম্বরণ সময়সূচি ঃ-

প্রগতিশীল সম্বরণ কার্যক্রমগুলি প্রাথমিক পর্যায় থেকে খনির ক্রিয়াকলাপের অংশ। খনির পরে পরিবহনের সময়কাল ৩ (তিন) বছর হিসাবে নেওয়া হবে এবং তারপরে ২ (দুই) বছরের জন্য বন্ধ হওয়ার পরে একটি পর্যবেক্ষণ সময়কাল থাকবে।

### আর্থিক দিক ঃ-

খনি মালিকদের একটি এসক্রো অ্যাকাউন্ট (escrow account) (ফিক্সড ডিপোজিট) স্থাপন করা উচিত যাতে খনি রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল পাওয়া যায় তা নিশ্চিত করার জন্য, খনির জমি / প্রকল্প এলাকায় কোনও কার্যকলাপ করার আগে কয়লা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাকে একচেটিয়া সুবিধাভোগী হিসাবে রাখা উচিত।

খনির এলাকা এই ধরণের (ভূগর্ভস্থ বা ওপেনকাস্ট খনি)এর উপর ভিত্তি করে বন্ধ করার খরচ অনুমান করা হয় এবং বাণিজ্য সংস্থা ( ডাব্লুপিআই) এর মতো সূচক অনুসারে সময়ে-সময়ে তা সংশোধন করা হয়। খনি সংস্থা বা মালিক, সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সহ বার্ষিক অর্থ তফসিলি ব্যাঙ্কে জমা দেবে।

### Escrow অর্থের পরিমানের পরিশোধ ঃ

সাসপেনশন অ্যাকাউন্টে অর্জিত সুদ ব্যতীত,পূর্ববর্তী বছরের মোট আমানতের ৫০% পর্যন্ত অর্থ প্রতি বছর খনি সম্বরণ করণ (Mine Closure) সংক্রান্ত কার্য ক্রমের অগ্রগতির মুক্তি করা যেতে পারে। ৩১.০১.২০২৫ তারিখের নতুন নির্দেশিকা অনুসারে জমা কৃত পাঁচ বছরের তহবিলে কমপক্ষে ২৫% সম্প্রদায়িক উন্নয়ন এবং জীবিকা সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপের জন্য ব্যবহার করা হবে।

সম্বরণ যোজনা আর্থিক নিরীক্ষার পরিপেক্ষিতে গত পাঁচ বছরে প্রগতিশীল খনন কার্যাবলীর জন্য সুদ সহ অবশিষ্ট অর্থের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৫০% পর্যন্ত মঞ্জুর করা হবে। অবশিষ্ট অর্থ খনি সকল নির্ধারিত বিধান মেনে যথাযথ ভাবে পালন সাপেক্ষে চূড়ান্তভাবে বন্ধ করার পরে খনি মালিক/ইজারাদারকে দেওয়া হবে।

পুনর্বাসন কার্য সম্পন করার পরে তদারকি সময়সীমা শেষে ৯০ শতাংশ খনির মালিক বা ইজারাদার দ্বারা যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার সমস্ত বিধান মেনে খনি মালিককে ছেড়ে দেওয়া হবে, যেখানে বলা হয়েছে যে খনি পুনরুদ্ধারের সময়, কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, আদালত ইত্যাদি দ্বারা প্রদত্ত সমস্ত বিধিবদ্ধ বিধি যথাযথ ভাবে পালন করা হয়েছে এবং তা সংশ্লিষ্ট কর্তিপক্ষ কয়লা নিয়ন্ত্রক এই নিয়মাবলী মেনে চলেছেন এবং যথাযথভাবে শংসাপত্র দিয়েছেন।

চূড়ান্ত খনি বন্ধ হওয়ার পর অবশিষ্ট ১০% অর্থ দিয়ে একটি ট্রাস্ট / তহবিল গঠন করা হবে। জেলা প্রশাসন, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করে খনিটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সামাজিক রূপান্তরের জন্য এই অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে।

### চূড়ান্ত সম্বরণ প্রমাণ-পত্র ঃ-

খনি সম্বরণ করার জন্য সিসিও (CCO) একটি শংসাপত্র জারি করবেন যে, খনি মালিকের চূড়ান্ত খনি পরিকল্পনা অনুসারে সুরক্ষা, পুনরুদ্ধার, পুনর্বাসন এবং স্থিতিশীলতার কাজ করা হয়েছে।

### ইসিএল-এ খনি সম্বরণ যোজনার অবস্থা ঃ-

কয়লা মন্ত্রালয়ের ২০০৯ সালের নির্দেশিকা অনুসারে, ২০১৩ সালে ৮৮ টি খনি বন্ধ করার পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছিল। নতুন নির্দেশিকা ২০২০ জারি করার পরে খনি বন্ধ পরিকল্পনাটি সংশোধন করা হয়েছিল। কয়লা মন্ত্রালয় ৩০.০১.২০২৫ তারিখে কয়লা এবং লিগনাইট ব্লকের জন্য খনি পরিকল্পনা এবং খনি বন্ধ পরিকল্পনা ২০২৫ প্রস্তুত করার জন্য নির্দেশিকা জারি করেছে। কয়লা মন্ত্রক ৩১.০১.২০২৫ এ জারি করা নতুন নির্দেশিকা অনুসারে সমস্ত অপারেশনাল খনিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে ৬৩ টি পুনর্গঠিত খনি বন্ধ পরিকল্পনা সংশোধন করা হয়েছে।

জামুড়িয়া এবং সেন্ট্রাল জামুড়িয়া নামে দুটি চূড়ান্ত খনি সম্বরণ পরিকল্পনা (এফএমসিপি) যৌথভাবে জামুরিয়া গ্রুপ খনি হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে, যা ২৫.০৫.২৪ এ ইসিএল বোর্ড দ্বারা প্রস্তুত এবং অনুমোদিত হয়েছে। এ জন্য খনি সম্বরণের চূড়ান্ত কার্যক্রম চলছে।

**নীলাদ্রি রায়**
নিদেশক (প্রযুক্তি) সঞ্চালন, ইসিএল

পৃষ্ঠপোষক

# ভাষা এবং প্রযুক্তি

ভাষা শব্দটি সংস্কৃত মূল ''ভাষ্'' ধাতু থেকে উদ্ভূত যার অর্থ বলা বা বক্তব্য প্রকাশ করা এবং এর মাধ্যমে লোকেরা তাদের কথা, চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি অন্য ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করে। ভারতীয় ভাষাবিদ এবং পণ্ডিতরা ভাষা চিন্তার ক্ষেত্রে খুব সূক্ষ্ম এবং গভীর অধ্যয়ন করেছিলেন। বৈদিক যুগে, ভাষার জন্য ''বাক'' শব্দটি ব্যবহৃত হত। এই 'বাক' শাশ্বত এবং ব্রহ্ম বলে বিবেচিত হত - বাগ বৈ বিরাট, বাগ বৈ সরস্বতী, বাগ বৈ মতি, বাগ বৈ ধি। এই বাক্ বা শব্দের তিনটি স্তরে স্বর্গীয় জগৎ, মহাকাশ ও পৃথিবী কল্পনা করা হয়। ভারতীয় ভাষাবিদরা ভাষার চারটি রূপ বর্ণনা করেছেন পারা, পশ্যন্তী, মধ্যম এবং বৈখারী। ভাষার এই চারটি রূপের মধ্যে প্রথম তিনটি সুপ্ত, কেবল একটি বৈখারী রয়েছে যা শ্রবণযোগ্য।

ভাষার প্রক্রিয়ায় দুটি ক্রিয়া বিবেচনা করা হয়, উৎপাদন এবং গ্রহণ। একজন ব্যক্তি সংকেতের মাধ্যমে তার বক্তব্য প্রকাশ করে এবং অন্য ব্যক্তি সেই সংকেতগুলি বুঝতে পারে এবং অর্থ গ্রহণ করে, এই প্রক্রিয়ায় লক্ষণগুলি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। মৌখিক ভাষায় বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হয় এবং লিখিত ভাষায় সেই ধ্বনিগুলিকে লিখিত প্রতীকের মাধ্যম প্রকাশ করা হয়, এই চিহ্নগুলিকে অক্ষর বলা হয়।

সমাজ গঠনে ভাষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজ ব্যক্তির সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে গঠিত হয় এবং সকল ব্যক্তিকে এক সুতোয় ঐক্যবদ্ধ করে - 'ভাষা'। লিখিত, মৌখিক এবং প্রতীকী হিসাবে ধারণাগুলি প্রকাশ করার অনেকগুলি উপায় রয়েছে। কিন্তু ব্যাপক প্রকাশের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যমটি সর্বসম্মতিক্রমে কথা বলার মাধ্যমে, অর্থাৎ মৌখিকভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। ভাষার সৃষ্টি একদিনের আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং বহু বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ভাষার সৃষ্টি হয়েছে, যার মধ্যে ধীরে ধীরে পরিবর্তন ও পরিমার্জন চলছিল, যে কারণে হাজার বছর আগে যে ভাষায় কথা বলা হত, বর্তমান সময়ে সেই ভাষার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। জলবায়ুর পাশাপাশি ভৌগোলিক অবস্থাও ভাষা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা মানুষের স্বরবর্ণ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে।

মানব জীবনে ভাষার স্থান সর্বাগ্রে এবং ভাষার অভাবে একটি মানব সমাজ কল্পনা করা যায় না। ভাষা মানুষের পাশাপাশি সমগ্র সমাজকে এক সূত্রে যুক্ত করার চেষ্টা করে। ভাষা শুধু ভাবনা প্রকাশ করে না, ভাষা একজন ব্যক্তির সভ্যতা ও সংস্কৃতিরও প্রতিফলন ঘটায় । পোশাকের পরে, 'ভাষা' যা ব্যক্তির পরিচয় দেয়।

ভাষা এবং প্রযুক্তির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং পরিপূরক। প্রযুক্তিগত অগ্রগতি বিশ্বের সমস্ত ভাষাকে একটি বিশ্বব্যাপী প্ল্যাটফর্ম দিয়েছে। ট্রান্সলেশন সফটওয়্যার, ইউনিকোড, ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট, অনলাইন কোর্স ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে একে অপরের কাছাকাছি চলে এসেছে, প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, কারিগরি

নির্দেশনা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা ভাষার উপর ভিত্তি করেই হয়। আজ কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মোবাইলের মতো প্রযুক্তির কারণে ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি স্টোরেজ, প্রসেসিং এবং তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যম হয়ে উঠেছে। প্রযুক্তি এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমাদের দৈনন্দিন জীবন সহজ হয়ে উঠেছে। ভারতে ই-গভর্নেন্স এভাবে শুরু হয়েছিল যেখানে ই-গভর্নেন্স অর্থ ইলেক্ট্রনিক এবং ই-গভর্নেন্স অর্থ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে সরকারী পরিষেবাগুলি পরিচালনা এবং সরবরাহ করা। এটি কেবল ভাষাগত প্রতিবন্ধকতাই ভেঙে দেয় না, সরকারী কাজের প্রসারও নিশ্চিত করে। এটি ই-মেল, ওয়েবসাইট ইত্যাদির মতো সরকারী প্রক্রিয়াগুলি সহজ এবং সহজতর করতে ব্যবহৃত হয়। আজকের যুগে প্রযুক্তি বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ভাষাকে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা একটি নির্দিষ্ট দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে না। প্রযুক্তিগত অগ্রগতি প্রতিটি ব্যক্তির জন্য প্রতিটি ভাষায় অ্যাক্সেস করা সহজ করে তুলেছে। যাদের প্রথম ভাষা হিন্দি, বাংলা, ওড়িয়া, ইংরেজি বা অন্য কোনও ভাষা, তাদের জন্য গুগল ইনপুট টুল ভাষার বাধা দূর করেছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার মতো উদ্যোগের মাধ্যমে মানুষ আধার নিবন্ধীকরণ, ডিজিটাল লকার, ই-সঞ্জীবনীর মতো বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে উপকৃত হয়েছেন।

ইলেক্ট্রনিক টেলিগ্রাফ ইত্যাদির মাধ্যমে নাগরিকরা দৈনন্দিন কাজে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে যে কোনো তথ্য পেয়ে যাচ্ছেন। যেমন, যে কোনো তথ্য পেতে এখন আর লম্বা লাইন বা ঘন ঘন অফিসে যাওয়ার দরকার হয় না, তবে বাসায় বসেই মোবাইল বা কম্পিউটারের মাধ্যমে অনলাইন ফরম পূরণ করা হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য পাওয়া যায়। এতে সময় ও সম্পদ দুটোই সাশ্রয় হয়।

ভারত সরকার কারিগরি শিক্ষা এবং ডিজিটাল সাক্ষরতার বিষয়ে প্রচার চালাচ্ছে। ফলস্বরূপ, ভারতের প্রতিটি ব্যক্তি এটি ব্যবহার করছে, যার ফলে একটি কার্যকর, প্রতিক্রিয়াশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

**গুঞ্জন কুমার সিনহা**
নিদেশক (মানব সংসাধন), ইসিএল

পৃষ্ঠপোষক

# জনসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ সম্মিলিত দায়বদ্ধতা

আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন গাছ আমাদের জন্য কতটা উপকারী? গাছবিহীন একটি পৃথিবী কল্পনা করুন - গরম গ্রীষ্ম, শুস্ক ভূমি, অনুর্বর মাঠ, কোথাও কোনো ছায়া নেই এবং সকাল-সকাল পাখির কিচিরমিচির নেই। গাছ আমাদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি "গ্রহের ফুসফুস" এর মতো যা তাদের প্রাকৃতিক চক্রের অংশ হিসাবে কার্বন-ডাই অক্সাইড ($CO_2$) শোষণ করে অক্সিজেন ছেড়ে দেয়, আরও বেশি গাছ লাগানো বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই অক্সাইডের পরিমাণ হ্রাস করে বাতাসকে বিশুদ্ধ করে এবং বায়ুমণ্ডলকে পরিষ্কার করে তোলে।

বন বিভিন্ন প্রজাতির আবাসস্থল সুনিশ্চিত করে, বন উজাড়ের ফলে জীববৈচিত্র্য হ্রাস পায় এবং গণবিলুপ্তি ঘটে। গাছ দীর্ঘদিন দূষণমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখতে সাহায্য করে। গাছ জলবায়ু নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি জল সংরক্ষণ এবং মাটি সংরক্ষণে সহায়তা করে। আমরা যদি অতীতের কথা বলি তাহলে এটা সত্যি যে পৃথিবীর অধিকাংশ অংশ অরণ্যে আচ্ছাদিত ছিল। ২০০০ বছর আগে পর্যন্ত, পৃথিবীর প্রায় ৮০% জমি বনভূমি দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, তবে বর্তমানে মাত্র ২০%-৩০% অবশিষ্ট রয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী উদ্বেগের বিষয়।

সবুজ কৌশলগুলি প্রচার করার জন্য, প্রতি বছর ইসিএল কেবল পরিবেশ দিবসই নয়, সমাজ এবং মানুষকে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করার জন্য সারা বছর ধরে একটি বৃক্ষরোপণ প্রোগ্রামের আয়োজন করে, যার ফলস্বরূপ পুরো ইসিএল অঞ্চলে ৩৩০০ এরও বেশি অংশগ্রহণকারী ২৫,১৪০ টিরও বেশি গাছ রোপণ করেছিলেন। ড্রোনের সাহায্যে সিড-বল রোপণ সহ অনেক উদ্ভাবনী বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমের লক্ষ্য রাখা হয়েছিল।

ইসিএল তার পরিবেশ নীতির অংশ হিসাবে "টেকসই উন্নয়ন" কে অগ্রাধিকার দেয়। এই নীতিটি কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের (সিআইএল) পরিবেশ নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার মধ্যে দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জীব বৈচিত্র্য, সংরক্ষণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং সচেতনতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সংস্থাটি মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ৬৯.৫০ লক্ষ চারা রোপণ করেছে এবং মোট ৩৩৮৯ হেক্টর এলাকা সবুজ করা হয়েছে।

প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের মধ্যে বীজ-বল রোপণ এবং ড্রোন-ভিত্তিক বৃক্ষরোপণ (মিয়াওয়াকি পদ্ধতি), ঘন, স্থানীয় জীববৈচিত্র্য, ফল এবং ঘরোয়া উদ্ভিদও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইসিএলের পরিবেশগত সিএসআর কার্যক্রমের অংশ হিসাবে, প্রতি হেক্টর জমিতে প্রায় ২৫০০ চারা রোপণ করা হচ্ছে। বৃক্ষরোপণের মধ্যে সাধারণত বনায়ন, ভূমি পুনরুদ্ধার বা ল্যান্ডস্কেপিং জড়িত। আগামী প্রজন্মের উন্নত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে বৃক্ষরোপণ অত্যন্ত জরুরি। গাছপালা শুধু সবুজই দেয় না, এটি একটি সুস্থ ভবিষ্যতের নিঃশ্বাস। আজ আমরা যে বীজ রোপন করছি তা আগামীকালের ছায়া হয়ে উঠবে। আসুন আমরা গাছের সাথে বন্ধুত্ব করি এবং একটি সবুজ, পরিষ্কার এবং নিরাপদ ভবিষ্যতের দিকে পদক্ষেপ নিই।

"প্রকৃতির প্রতিটি স্পর্শে
মেলে শান্তি,
যা আমাদের অন্তরে
নতুন আলো জ্বালে।"

**গিরিশ গোপীনাথন নায়ার**
নিদেশক (প্রযুক্তি) যোজনা ব পরিযোজনা, ইসিএল

পৃষ্ঠপোষক

# কর্তব্য এবং সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা

প্রকৃত নাগরিক তিনিই যিনি জীবনে সততার পথে হেঁটে আকাশের উচ্চতা স্পর্শ করেন।

বর্তমানে যখন দেশ অগ্রগতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে , তখন আমাদের কর্তব্য শুধু নিজের অধিকার দাবি করা নয়, আমাদের কর্তব্যও যথাযথ ভাবে পালন করা। সংবিধান আমাদের অধিকারের পাশাপাশি মৌলিক কর্তব্যও নির্ধারন করেছে। মৌলিক কর্তব্য হল সংবিধান দ্বারা ভারতের প্রতিটি নাগরিকের উপর অর্পিত নৈতিক বাধ্যবাধকতা। নাগরিকদের মধ্যে দেশপ্রেম, রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সৌভ্রাতৃত্ববোধের প্রচার, ইতিবাচক নাগরিকত্বকে উৎসাহিত করা এবং সংবিধানের মূল্যবোধ সমুন্নত রাখার জন্য এই কর্তব্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য যে, প্রাথমিক ভাবে সংবিধানে এই মৌলিক কর্তব্যগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। যাইহোক, মূলত ভারতীয় সংবিধান,অনুয়ায়ী দেশের অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থার সময় এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয় । ১৯৭৬ সালে, ভারত সরকার মৌলিক কর্তব্য সুপারিশ করার জন্য ''সর্দার স্বর্ণ সিং" কমিটি গঠন করে। উক্ত কমিটির সুপারিশ অনুয়ায়ী সংবিধানে মৌলিক কর্তব্য সম্পর্কিত একটি পৃথক অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছিল। এর মধ্যে ৮ (আট) মৌলিক কর্তব্যের একটি তালিকা ছিল।

### ৪২তম সংবিধান সংশোধনী অধিনিয়ম, ১৯৭৬

কেন্দ্রীয় সরকার 'সর্দার স্বর্ণ সিং" কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করে এবং ভারতের সংবিধানে মৌলিক কর্তব্যগুলির তালিকা অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । তদনুসারে, ১৯৭৬ সালে, ৪২তম সংবিধান সংশোধনী আইন প্রণীত হয়েছিল, যা লঘু সংবিধান নামেও পরিচিত। যা সংবিধানে একটি নতুন অধ্যায় (ভাগ IVA) যুক্ত করে। এই নতুন অধ্যায় কেবল একটি অনুচ্ছেদ (অনুচ্ছেদ 51A) রয়েছে যা ভারতের নাগরিকদের দশটি মৌলিক কর্তব্যের একটি কোড নির্দিষ্ট করে।

### ৮৬তম সংবিধান সংশোধনী অধিনিয়ম, ২০০২

২০০২ সালের ৮৬ তম সংবিধান সংশোধনী অধিনিয়ম আরও একটি মৌলিক দায়িত্ব যুক্ত করেছে। তখন থেকে, ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক কর্তব্যগুলির তালিকা স্থির রয়েছে।

বর্তমানে, সংবিধানের ভাগ (IVA) এর অনুচ্ছেদ 51A তে এগারোটি মৌলিক কর্তব্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা নিম্নরূপ -

১. সংবিধান মেনে চলা এবং এর আদর্শকে সম্মান করা;
২. রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করা মহৎ আদর্শকে লালন করা;
৩. ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও অখণ্ডতা বজায় রাখা;
৪. দেশের প্রতি ভক্তি;
৫. ধর্ম, ভাষা ও আঞ্চলিক বৈচিত্র নির্বিশেষে সকল নাগরিকের মধ্যে সদিচ্ছা ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা;
৬. দেশের সমৃদ্ধ মিশ্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে মূল্যায়ন ও সংরক্ষণ করা;
৭. বন, হ্রদ, নদী ও বন্যপ্রাণীসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করা;
৮. মানবতাবাদ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ, আবিষ্কার ও উন্নতির চেতনা গড়ে তোলা;
৯. সার্বজনীন সম্পত্তি রক্ষা করা;
১০. এবং সম্মিলিত গতিবিধির সকল ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য নিরন্তন প্রয়াস করা;
১১. বাড়ি থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের শিশুদের শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা।
(২০০২ সালে ৮৬ তম সংবিধান সংশোধনী অধিনিয়ম)

একইভাবে, আমাদের সবাইকে আমাদের দেশ এবং পরিবেশের পাশাপাশি আমাদের নিজস্ব সংস্থা যেখানে আমরা কর্মরত তার সাথে একটি আন্তরিক এবং উৎপানশীল সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহযোগিতা করতে হবে। কোম্পানির সাথে আমাদের সূক্ষ্ম সম্পর্কের বীজ আমাদের আদর্শ, কর্তব্য, দায়িত্বের মধ্যে অন্তর্নিহিত করতে হবে। প্রত্যেক কর্মচারীকে অবশ্যই সততা, আনুগত্য এবং দক্ষতার সাথে কাজ করতে হবে। সর্বদা আমাদের তাৎক্ষণিক উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনে চলা উচিত এবং একই সঙ্গে সময়ানুবর্তিতা বজায় রাখা একান্ত রূপে অপরিহার্য। দুর্নীতি, ঘুষ বা অযৌক্তিক সুবিধার্থে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। একে অপরের সহযোগিতা এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আমাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়ে আমাদের দেশকে অগ্রগতির শীর্ষে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, যাতে আগামী প্রজন্মের জন্য এটি প্রেরণা স্তম্ভ হয়ে উঠতে পারে।

**দীপ্তি পটেল**
মুখ্য সতর্কতা আধিকারী
ইস্টার্ন কোলফিল্ডস্ লিমিটেড

সম্পাদকীয়

# আদিবাসী সাঁওতাল সমাজের বিকাশে নারীর ভূমিকা

আমাদের সাঁওতাল সমাজে বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী থাকা সত্তেও সাঁওতালরাও ভীষণ রকম আগ্রাসনের শিকার হয়ে থাকে। পুরুষরা সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক থেকে নানা রকমের অসহায় পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারলেও নারীদের জীবন হয়ে ওঠে অসহনীয়। শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে পড়ার কারণে তারা মর্যাদাহীন জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। সামাজিক সাংস্কৃতিক ভাবে ক্রমশ তারা দুর্বল হয়ে পড়ে।

দারিদ্র, অসচেতনতা, শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে নিজের ভাষায় লেখাপড়ার সুযোগের অভাবে, কুসংস্কার, নিরাপত্তাহীনতার মতো নানা কারণে অধিকাংশ সাঁওতাল নারী শিক্ষা জীবনকে শ্রেষ্ঠ করার আগেই ঝরে পড়েছিল। আমাদের বৃহত্তর সমাজে নারীর যে চিত্র আমরা পাই, আদিবাসী সাঁওতাল সমাজের নারীরাও সেই একই রকম বঞ্চনার ও বৈষম্যের শিকার হত।

আগেকার যুগে গৃহস্থালি ক্রিয়াকর্মে গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিতে উৎপাদনশীলতায় নারীর ভূমিকার যথাযথ মূল্যায়ন হত না, এমনকি সন্তান জন্মদান ও লালন পালন দিয়ে নারী যে ভূমিকা পালন করে, তারও যথাযথ স্বীকৃতি ছিল না।

কিন্তু বর্তমান যুগে আদিবাসী নারীরা শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করতে দ্বিধা করে না এবং তারা পরিবারের জীবনযাপনে প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেন। আদিবাসী নারীরা শুধুমাত্র ঘরের কাজেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেন না, তারা কৃষিকাজ, বনজ সম্পদ সংগ্রহ, বাজার করা এবং উপার্জনের কাজে পুরুষের সাথে সমানভাবে অংশগ্রহণ করছেন। তাদের এই অর্থনৈতিক অবদান তাদের সম্মান বৃদ্ধি করে। আদিবাসী নারীরা সাধারণ সামাজিক ও পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন ও এখান তাদের মতামতের গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ।

সাঁওতাল সমাজে নারীর মূল্যায়ন বা ভূমিকা অনেকটাই দৃষ্টান্ত মূলক। এখন শিক্ষার আলোক ধারায় সাঁওতাল সমাজের নারীরা হয়ে উঠেছে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত, বুদ্ধিভিত্তিক ও আধুনিক চিন্তা ধারায় সমৃদ্ধ এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বর্তমানে নারীদেরকে সমস্ত জায়গায় অবদান দেওয়া হয়েছে। কৌশলগত শিক্ষা ও সামাজিক কাজে নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমান ভূমিকা লাভ করেছে। নারী আর আগের মত পিছিয়ে নেই। বর্তমানে নারীকে এখন সবার উপরে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

**নমিতা মাঝি সরেন**
সম্পাদিকা

# আমি

হাজার বার নিজেকে
প্রশ্ন করি! আমি কে?
আমি কি ভীষণ দামি...
আমার অহংকার
আমার আমি
কি রক্ত মাংসের মানুষ
আমির মধ্যে আবদ্ধ
এক জড় পদার্থ
আমার আমি,
তোমার চোখের দৃষ্টি ভঙ্গি
আমি দর্প, আমি গম্ভীর, আমি নিশ্চুপ...
আমার আমি ভীষণ অভিমানী
আমার আমি কে কখনো,
গলা টিপে হত্যা করি
আমার আমি কে কখনো
খুব খুব ভালোবাসি
কেন কি ...
আমার সাথে আছে
মন আর হৃদয় জুড়ে
আলিঙ্গন

**শিপ্রা দাসগুপ্ত**
কোয়ালিটি কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট
সদর দপ্তর, ইসিএল

# ক্রমশ এগিয়ে

চলছে চলবে কয়লা
অদ্ভুত এক সৃষ্টি নিয়ে
গর্বিত আজ শ্রমিকরা
তাদের ঘর্মাক্ত কায়িক পরিশ্রম দিয়ে।

উত্তোলন নানাভাবে এখন তুলনামুলক
বর্তমানে নানা উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্রের মাধ্যমে
দিনরাত এক করে প্রয়াসে
কেবলই উন্নতি সাধনে এককরে।

কয়লা ঘিরে কয়লা অঞ্চল
কত কত রোজগারের হয়ে পাথেয়
অনুসঙ্গীক দোকানদানি ব্যবসা-বাণিজ্য বাজার
ক্রমশঃ সংসারিক জীবনে অবদান হয়ে শ্রেয়।

আরো আরো হোক উত্তোলন উত্তরোত্তর
প্রতি বছর বৃদ্ধিতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে
এগিয়ে চলতে কয়লা শ্রমিক
দলে - দলে মিলেমিশে একমতে।

**শম্ভুনাথ পাল**
অবসর প্রাপ্ত কর্মী
শঙ্করপুর ও.সি.পি., ইসিএল

# উত্তরাধিকারী

দীর্ঘদিনের চলার অবসান ঘটিয়ে অবসর গ্রহণ। কর্ম্মজীবনের শেষ। যবনিকা। দেওয়া-নেওয়া, গোছালো-অগোছালো কর্তব্যবোধ সবই যেন শেষ পর্য্যায়ে। শুরু হয়ে যায় 'চতুর্থ অধ্যায়'-এর পথচলা বার্দ্ধক্যের দোরগড়া থেকে। তীক্ষ্ণ অনুভবী মনটাও সেদিন বুঝতে পারে এবার তার সংসার থেকে অব্যাহতি নেওয়ার সময়। আগেকার দিনে যেটাকে বানপ্রস্থ বলা হত।

মনে প্রচণ্ড কষ্ট হলেও অবসর প্রাপ্ত সুকান্ত তার কর্ম্মস্থানের মায়া কাটিয়ে পেনশন-টেনশনের ঝামেলা মিটিয়ে 'প্রত্যাবর্ত্তন' করল...। তবে উচ্চাকাঙ্খিত বিলাস বহুল শহরের বাবু কালচারাল হাই প্রোফাইল সোসাইটির ফ্ল্যাট বাড়িতে নয় কাদামাটি মাখা গ্রামের ছেলে ফিরে এল সেই গ্রামের বাড়ীতেই। যেখানে তার জন্মভূমি। যেন পবিত্র গঙ্গা মাটি।

"যেথা সবুজ ধানের ক্ষেত পেরিয়ে তেপান্তরের মাঠে
পেখম তুলে নাচে ময়ূর রামধনু রং মেখে
মন রাঙিয়ে ক্ষেপা বাউল গান গেয়ে যায় ওরে
মাটির ঘরে খড়ের ছাওয়া লক্ষ্মী বিরাজ করে।"

সুকান্ত'র ইচ্ছা অবসর সময়ের অবশিষ্ট দিনগুলো পরহিতে ব্যয় করতে। গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষজন যাদের 'নুন আনতে পান্তা ফুরোয়' তাদের পাশে থাকতে। তাদের সার্ব্বিক উন্নয়নের দিকে নজর দিতে। শিক্ষা-দীক্ষায় সচেতন করে তুলতে। যেখানে স্বাধীনতার ৬৮ বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পরও গ্রামে গঞ্জে তেমনভাবে আধুনিক সভ্যতার আলোয় আলোকিত হয়নি। বিকাশ ঘটেনি, নেই পথ-ঘাট, স্কুল-কলেজ, ঝলমলে বৈদ্যুতিক আলোর প্রভাব। এমনকি উন্নত মনের চিকিৎসা পর্য্যন্ত। অবসর সময়ে সেইসব মানুষজনদের জন্য যদি কিছু করা যায় তবে সেটাই হবে তার অবসর জীবনের প্রকৃত কাজ।

আজকের দিনে প্রকৃত মানুষের বড়ই অভাব। যার ভেতরটা হবে সুনীল আকাশের মতো স্বচ্ছ-উদার-অমলিন-চিরভাস্বর। থাকবে মনুষ্যত্ববোধ। হবে বিবেকবান ও কর্ত্তব্যপরায়ণ। যে দেশ ও দশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবে। পারবে জাতি ও জাতীয়তাবোধের উন্নতি সাধন করতে।

কথায় আছে-অবসর প্রাপ্ত মানুষ তার অবসর জীবন যাপনের জন্য যদি উপযুক্ত পরিবেশ না পেয়ে থাকে, যেথা মনের মতো মানুষ থাকবে। মনখুলে সমস্ত কথাবার্ত্তা বলে ভেতরের ভাবকে উগরে দিয়ে হাল্কা হতে পারবে অথবা কোন সৎ-প্রতিষ্ঠানের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে উজাড় করে মিশে যেতে না পারলে সংসারটা তার কাছে দুর্বিসহ হয়ে উঠবে। তখন তার মনে সবার অজান্তে কতগুলো 'দুশ্চিন্তা' বাসা বাঁধতে থাকবে। যেগুলো সর্বদাই তার মনকে তাড়া করতে থাকবে। আরও দুর্বল করে দিতে পারে। গ্রাস করবে ভীত মন্যতা বা Fear Complex, হীনমন্যতা বা Inferiority Complex. পরাজিত হবার ভয় বা মৃত্যুভয়। যেগুলো প্রতিনিয়ত মনটাকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে আর রোধ করে দেয় এগিয়ে যাবার গতিপথটাকে।

দিনের আলোয় হয়ত কোন প্রকার সময়টা কাটলেও রাতের বিভীষিকায়? কি ভীষণ দুর্বিসহ। ভয়ঙ্কর। যন্ত্রনাদায়ক। তখন আরও দুষ্কর হয়ে উঠে তার জীবন যাপন। যেটা কাটতেই চায় না মন থেকে। তখন যেন প্রাণান্তকর হয়ে উঠে নিশুতি রাতের বোবাকান্না। চারিদিক থেকে গ্রাস করতে আসে এক অজানা আতঙ্ক। ভয়...। মৃত্যুভয়...। এই বুঝি তার গলাটা টিপে ধরবে। মেরে ফেলবে....। সেই মৃত্যুটা যেন আরও কষ্টকর। আরও ভয়ঙ্কর। আরও যন্ত্রনাময়। তখন আনচান করে উঠে প্রাণ..। মনে থাকে না শান্তি। চোখে থাকে না ঘুম..। সুখ শয্যাটাও হয়ে উঠে কন্টাকীর্ণ। যার জ্বালা অসহনীয়। বিছানায় শুয়ে ছট্ ফট্ আর এপাশ-ওপাশ করা। ড্যাব ড্যাবে চোখ দুটো কিছুতেই বন্ধ হতে চায় না। আবার জোর করে বন্ধ করতেই যেন ঐ অজানা আতঙ্কটা আবার গ্রাস করে। চেপে ধরে কণ্ঠনালীটা। কেঁপে উঠে বুকের হৃৎপিণ্ডটাও.. শুকনো গলাটা ভিজাতে ঘন ঘন জলপান আর প্রসাধন কক্ষে যাওয়ার ফলে অন্যের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় শুনতে হয় কটাক্ষ আর তীর্যকের তীরটাও এসে গায়ে লাগে যার জ্বালা অসহনীয়। তখন কেউ বুঝতে চায় তার মনের কষ্টটা কোথায়? প্রাণের বেদনাটা বা কোথায়? সান্তনা দেবারও কেউ থাকে না। একাকিত্বের তীব্র জ্বালায় ঐ গভীর রাতে আঁকুপাঁকু করা হাঁপিয়ে উঠা মনটাকে শান্ত করতে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়া ঐ প্রশস্থ আঙ্গিনায় অথবা বাড়ীর খোলা ছাদের মুক্ত হওয়ায় পায়চারি করতে করতে কিছুটা হালকা অনুভব হতেই আকাশের মিটিমিটি তারাগুলোর সাথে চুপি-চুপি কিছু কথা ভাবের আদান প্রদান আর উজ্জ্বল ধ্রুব তারার দর্শনে দ্বিধাযুক্ত মনে - 'রাত কাটে ভোর হয় পাখী জাগে বনে চাঁদের তরণী কখন যে ধরণীর কোনে' পৌঁছে যায় বোঝা যায় না।

আফশোষ তখনই হয় - যখন তার মনের ব্যাথাটা কোথায়? কেউ বোঝে না বা বুঝেও বুঝতে চায় না। শুনতেও চায় না। আজকের দিনে উল্টো ঝামেলায় কে জড়াতে চায় ? তার থেকে দূরে দূরে থাকাটাই শ্রেয় - এই মনোভাবটা প্রায়ই।

যে মানুষটা মনপ্রাণ দিয়ে সমস্ত রোজগার দিয়ে ভেসে যাওয়া সংসারটাকে দাঁড় করাল। টলমলে ভাঙ্গা নৌকার হালটা শক্ত করে ধরে সংসার সমুদ্রের বুকে তর তর করে এগিয়ে নিয়ে গেল। পিতৃ-মাতৃ হীন ছোট ছোট ভাইবোনদের বুকে আঁকড়ে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষের মত মানুষ তৈরী করল - সেদিন সুকান্ত ছিল সবার কাছে অতিপ্রিয় জন। কাছের মানুষ। দাদা, কাকা, মামা। হয়ত বা কেউ পর্ব্বত শিখরে তুলে 'গুরুদেব' আখ্যা দিতেও কসুর করেনি। আবার কোন সহৃদয় ব্যক্তি আরও উপরে ঐ নীল আকাশের বুকে তুলে 'পিতৃতুল্য আখ্যা দিতেও কার্পণ্য করেনি।' ওর মত মানুষ হয়না - এই রকম নানান গালভরা তকমা জুটেছিল। সেদিন সুকান্ত'র হাতে ছিল - ক্ষমতা, পাওয়ার, স্পেশাল পাওয়ার। অর্থ-যশ-প্রতিপত্তি। দেবারও ছিল অনেককিছু। সেদিন ঐ 'কল্পতরুর' কাছে যে যা চেয়েছিল , পেয়েছিল। ভাই-বোনদের বিয়ে দেওয়া, মাটির ঘর ভেঙে পাকা বাড়ী তৈরী করা। সার্বিক উন্নয়নের কাজে সাহায্য পিতা-মাতার চিকিৎসা ছাড়াও যেদিকে জল পড়েছিল সেদিকে ছাতা ধরেছিল সুকান্ত। 'সময় বহিয়া যায় নদীর গতির প্রায়।' তারপর সেই সময়ের জোয়ার-ভাটায় একদিন সবকিছু ভেসে গেল। আজ আর নেই সেই শিউলী ঝরা সকালের সোনালী রৌদ্দুর...। মধ্য গগনে তেজদীপ্ত সূর্যের প্রখরতা অথবা পূর্ণিমা জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ ধারায় ভাসিয়ে দিতে। নেই অর্থ-যশ-প্রতিপত্তি। নেই দুর্ব্বার গতিতে এগিয়ে যাওয়ার প্রবল প্রতাপ। সুকান্ত আজ অবসর প্রাপ্ত, ক্লান্ত, কর্মহীন, আজ আর দেবার মতো কিছু নাই। হয়তো তাই নেই ভ্রমরের আনাগোনা। গুন গুন গুঞ্জনও। সে আজ অবাঞ্ছিত। অধ্যংতেয়। আবার নির্ভরশীলও - তবুও শুধু পথচলা, অন্তহীন সীমানায়।

কিন্তু সেই আশায় জল ঢেলে ডানামেলে উড়ে গেছে একে একে ঐ নীল আকাশের বুকে দুরে আরও দূরে ..... সাত সমুদ্র তের নদীর পারে পরিবর্ত্তে দিয়ে গেছে এক একটা 'ধাক্কা'। যে ধাক্কাগুলো সামলাতে হিমসিম খেতে হয়

সুকান্তকে। লজ্জায়, ঘৃণায় অভিমানের দাবানলের দহনে জ্বলে গেছে অন্তর। ভেঙ্গে পড়েছে মন। বিতৃষ্ণাগ্রস্ত সুকান্ত নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে-

- কর্তব্য পালন করাটা কি অপরাধ?
- স্নেহ, মায়া, ভালোবাসা এবং বিশ্বাস করাটা কি অন্যায়?
- বার্দ্ধক্যটা কি জীবনের অভিশাপ?

ভাইদের মধ্যে সুকান্ত বড়, বর্ত্তমানে অবসর প্রাপ্ত। সুশান্ত মেজ। প্রশান্ত তৃতীয় মধ্যম এবং সর্ব্ব কনিষ্ঠ দিগন্ত। পর্যায় ক্রমে সকলেই সময়োপযোগী 'ধাক্কা' দিয়েছে যেগুলো সুকান্ত বুঝেও অবুঝের মত নীরবে সহ্য করেছে। প্রতিবাদ করেনি-পাছে লোকে কিছু বলে। পাছে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়ে সংসারটা ভেঙে তছনছ হয়ে যায়। পাছে কিছু অঘটন ঘটে যায়। হয়তো বা সে ভেবেছে এটাই তার নায্য পাওনা কর্তব্য পালনের প্রতিদান স্বরূপ?

কি বিচিত্র এই সংসার। যেখানে বিভিন্ন ধর্ম্ম, বিভিন্ন বর্ণ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের একত্রে বসবাস। যার ভেতরে রয়েছে স্নেহ, মায়া, প্রেম, প্রীতি ভালোবাসা বন্ধন সব কিছুই। অন্যদিকে প্রেম প্রত্যাখান উত্থান-পতন, আবার টক, ঝাল, মিষ্টিরও সমন্বয়। রয়েছে ভালোবাসলে আঘাত করবে, প্রশয় দিলে মাথায় উঠবে, উপকার করলে অস্বীকার করবে। যেগুলো মহাপুরুষদের অমোঘ বাণী এবং যুগে যুগে ঘটে চলেছে এবং ভবিষ্যতে ঘটবেও। গোস্বামী তুলসী দাস, বিল্বমঙ্গল কবিও ভালোবাসার আঘাত পেয়েছেন। সেখানে সুকান্ত'র ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হবে কেন?

এ সংসার থেকে পোড় খাওয়া তিতিবিরক্তি হয়ে যাওয়া সুকান্ত'র স্ত্রী সুপর্ণা গড়-গড় করে বলে যায় কতগুলো কথা যেগুলো অপ্রিয় হলেও সত্য এবং সেটা যে তীরের মত সুকান্ত'র বুকে বিঁধতে লাগল সন্দেহ নেই।

তোমার সংসারে আসার পর থেকে আমি শুধু খেটেই গেলাম। প্রতিদিন সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা, তিনবেলা করে হেঁসেল ঠেলা। অতগুলো মানুষের পেটের জোগাড়, বৃদ্ধ শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সেবাযত্ন। ছোট-ছোট ভাইবোনদের দেখাশুনা, স্কুল পাঠান, টিফিন তৈরী, বাসন-কোসন, আত্মীয়-স্বজনদের যাওয়া আসা ছাড়াও সংসারের নানান ঝামেলা একা হাতে করতে করতে শরীরটা হাড় হয়ে গেল। সেদিকে নজর রেখেছিলে কোনদিন? তুমিতো প্রতিদিন সকাল বেলায় খেয়েদেয়ে বাবুর মতো কোলিয়ারী অফিসে গিয়ে বসতে, স্ফুর্ত্তি করতে, মজলিস করতে। আর এদিকে বাড়ীতে আমার উপর দিয়ে কি ঝড় বয়ে যেত সেটা কোনোদিন লক্ষ্য রেখেছিলে? রাখনি। রাখবে কেন? আমি তোমার কে?- এসব করে আমার কি লাভ হলো? কিছু না। আজ শুধু নেই - আর নেই। ধূ ধূ করা মরুভূমির মাঝখানে দাঁড়িয়ে থেকে মরুচিকার মায়াজালে বিভ্রান্ত হওয়া। তাই নয় কি?

সে তো সত্যি কথা। সুকান্ত আমতা - আমতা করে বলে উঠল।

পরবর্তীকালে তোমার ভাইবোনদের বিয়ে-থা দিয়ে সংসারী করা হলো সবই একা হাতে। দ্বিতীয় কেউ নেই যে আমাকে সাহায্য করবে। আজও সেই 'কৃতদাসীর' মত খেটেই যাচ্ছি। আজ আমার পড়ন্ত বেলায় শরীর মন দুর্ব্বল। সদ্য পেটের অপারেশনে আরও দুর্বল করে দিয়েছে। তাছাড়াও রয়েছে থাইরয়েড। ইউরিক অ্যাসিডের যন্ত্রনায় হাত-পা গুলো অবশ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু! হায়রে কপাল আমি যাদের জন্য এত করে গেলাম তারা আজ কেউ পাশে নেই। উড়ে গেছে। কেউ নেই যে এই দুর্দ্দিনে একটু সাহায্য করে দেয়। একটু সহানুভূতি দেখায়। একটু সান্ত্বনা দেয়। এর জন্য দায়ী কে? 'তুমি'। তোমার সাথে ঘর বেঁধে আমি কোনদিনই শান্তি পেলাম না। তছ-নছ হয়ে গেল জীবন-যৌবন। আর পারি না। এবার রেহাই দাও। এর থেকে গরীব দুঃখী পান দোকানদারের সাথে ঘর বাঁধলে জীবনটা সুখের হত। শান্তি পেতাম।

কথাগুলো সবটাই যে সত্যি মেনে নিলাম। এই নরাধমের হাতে না পড়লে হয়তো তোমার জীবনটা সার্থক হতো। সুখ-স্বাচ্ছন্দে ভরে উঠত। আমি মুর্খ। মহাপাপী হয়তো সেজন্যই কিন্তু বিশ্বপিতা আমাকে এত লাঞ্ছনা দুঃখ-কষ্ট দিচ্ছেন। আর আমার সাথে তুমিও...। আমি অক্ষম। তোমাকে শান্তি দিতে পারিনি। ক্ষমা করো...।

সত্যিই সুকান্ত'র জীবনটা যেন শুকনো সাহারা মরুভূমির মতো খটখটে। সংঘর্ষময়। এ জীবন এ সংসার তার কাছে বিষময়। অর্থহীন। চারিদিকে শুধু নেই আর নেই শুনতে শুনতে প্রাণটা ওষ্ঠাগত। এর চাইতে জীবনটা শ্রী চরণে উৎসর্গ করে দেওয়াটাই উচিত মনে করে সুকান্ত। কি লাভ বেঁচে থেকে? কি পেলো জীবনে? ব্যর্থতা অবসাদ আর অস্বস্তির তীব্র জ্বালা। - হায়রে কপাল! দরিদ্র পিতা-মাতার সংসারে জন্ম নেওয়ার পর থেকেই যেন সংগ্রাম শুরু। লড়াই আর লড়াই। বাঁচার লড়াই। একজোড়া পটি দেওয়া জামা প্যান্ট পরেই দিন কাটত। যতদিন না পর্যন্ত ক্ষয়ে ক্ষয়ে সেটার পরিসমাপ্তি ঘটে। ততদিন নতুন জুটত না। কখনও পাড়ার ছেলেদের চেয়ে মেগেও পরতে হয়েছে। খেয়ে না খেয়ে দিন কেটেছে। হয়ত বা কখনও ভালমন্দ খাবার অলীক স্বপ্নে বিভোর হয়ে ঢোক গিলতে গিলতে মামার বাড়ীতে বাল্যকাল কেটেছে। কথায় আছে 'ঢেকিকে স্বর্গে গেলেও ধান ভাণতে হয়।' সুকান্ত'র কপালটাতো তার সঙ্গেই...। তথৈঃ বচ। সেখানেও মাত্রাতিরিক্ত খাটা-খাটুনিও.....। একটু এদিক ওদিক হলেই কপালে জুটত ঝুড়ি ঝুড়ি গালমন্দ। মারধরও...। অনাদর অবহেলা আর লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত হয়ে লেখাপড়া। অকালে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন পিতামাতা। তাদের ফেলে যাওয়া অসম্পূর্ণ কাজের সমস্ত দায়িত্বভার কাঁধে নিয়ে টলমলে সংসারের হালটা ধরে সংসার সমুদ্রের বুকে ভাসতে-ভাসতে আজ বার্দ্ধক্যের দোরগড়ায়।

আজ পড়ন্ত বেলায়। গোধূলির ধূসর আলোচ্ছায়ায় বসে ঐ অজয়ের তীরে। পারের তীরে জানে না আরও কতদূর....। সামনে কালো নিকষ আঁধারে - লুকিয়ে যাবে প্রকৃতির সৌন্দর্য। নিভে যাবে জীবন প্রদীপ। হয়তো তাই চাই একটু আশ্রয়। নিরাপদ আশ্রয়। পুত্র বাৎসল্য ছোঁয়ায় মায়ের কোলে শিশু যেমতি লহে বিরাম। পরাশ্রয়ী পরগাছা বনলতা ওই....। কিন্তু!

'কিন্তু ! কে সেই সুন্দর ভাবে বোঝাবে জ্বলন্ত চিতার আগুন।'

কথায় আছে স্বামী স্ত্রী'র ঝগড়ার মধ্যে নাক গলাতে নেই। এটা কখন যে কোন দিকে মোড় নেয় বোঝা মুস্কিল। সুকান্ত যখনই অতি বিনীতভাবে ছল-ছল চোখে নিজের অক্ষমতার কথা বলতে লাগল তখনই স্ত্রী সুপর্ণার মনটা গলে বরফ। বইতে লাগল উজান ধারা।

– না-না তোমার দোষ হবে কেন? তুমি ঠিক কাজই করছো। শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর অবর্ত্তমানে তুমিইতো যোগ্য উত্তরসুরির কাজ করছো। আজকের দিনে এমন ক'জন করে? সেদিন যদি ভেসে যাওয়া সংসারটার হালটা শক্ত করে না ধরতে স্বার্থপরের মত কেটে পড়তে তবে ছোট ছোট ভাইবোনদের কি দশা হত? ভেবে দেখেছ? রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াত একমুঠো ভাতের জন্য।

- সেটা ঠিক কথা। স্ত্রী সুপর্ণা তার পক্ষেই কথা বলছে, তাই বুঝে মনে একটু সাহস পেয়ে সুকান্ত বলে উঠল কথাটা।

- তুমি নিজের কর্তব্য পালন করেছো। এরজন্য গ্রামের মানুষ, সমাজ এবং সবার উপরে আরও একজন আছেন, তিনিই অলক্ষ্যে থেকেও সবসময়ে লক্ষ্য রেখেছেন। সেই তারই উপর ছেড়ে দাও সবকিছু। তিনিই আমাদের পথ দেখাবেন।

- হ্যাঁ ঠিক তাই। ভাবগম্ভীর সুকান্ত'র চোখের কণাগুলো চিক্-চিক্ করে উঠল।

- তোমার কর্তব্য তুমি করেছো। - ওদের কর্তব্য ওরা করবে। এর জন্য চিন্তা কিসের? একমাত্র পরমেশ্বর ঈশ্বর ঐ বিশ্বপিতার চরণেই ভরসা।

'কেবল ঈশ্বর ঐ বিশ্বপিতা যিনি ,
সকল সময়ে বন্ধু সকলের তিনি।'

তাইতো ভগবান শ্রী কৃষ্ণ গীতায় বলেছেন - 'মা ফলেষু কদাচনম'। অর্থাৎ কর্ম করে যাও কিন্তু ফলের আশা করো না। সেটা তার হাতে। তিনিই সময়োপযোগী ফল দেন। আশা করলেই দুঃখ পেতে হয়। কষ্ট পেতে হয়।

হয়ত সুকান্ত'র ঘনিষ্ট আত্মীয় পরিজনদের ইচ্ছেটা অন্যজায়গায়। আরও গভীর। ধরা ছোঁয়ার বাইরে। 'যেন সাপও মরে লাঠি ও না ভাঙে।' যার প্রথম পদক্ষেপ অসহযোগিতা। প্রত্যাবর্তন বেশ কিছুদিনের মধ্যেই উপলব্ধি করতে পেরেছিল ভালোভাবে। কতগুলো কটু উক্তি আর তীর্যক কথার মাধ্যমে 'ওরা আর ক'দিন? যখন মরবে তখন কি ধন-সম্পত্তি, ঘরবাড়ি গুলো ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়ে যাবে?' সেই আমরাই নেব। ভোগ দখল করব। আধিপত্য করব।

অপ্রিয় সত্য কথাটিতে বেশ আঘাত পয়েছিল সুকান্ত। ভেঙে পড়েছিল 'মন'। বিঘ্নিত হয়েছিল - সৃষ্টির গতিপথ। দমে গিয়েছিল মনটাও আরও কিছু করবার প্রবণতা থেকে। কালক্রমে সুকান্ত দেয় খোঁজ খবর, দেওয়া-নেওয়া সবকিছুই যেন সংযত ভাবে হোতে লাগল। ক্ষীন থেকে ক্ষীনতর হয়ে বিলীনের পথে এগুতে লাগল সম্পর্কটাও। হয়তো বা কেউ ভুলক্রমে এসে পৌঁছালেও ক্ষনিকের তরে লুকোচুরি খেলার মতো বললেও ত্রুটি হয় না। সুকান্ত নিঃসন্তান। ছেলেপুলে নেই তাই এই বার্দ্ধক্য বয়সে সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন। সেজন্য যে তাদেরই ভরসা করতে হবে এই উপলব্ধিটা বেশ ভালোভাবে রপ্ত করেছে। সেজন্য তাদের দ্বিতীয় পদক্ষেপ সুকান্তকে যতবেশি চাপে রাখা যায় এবং পরোক্ষভাবে দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনার শিকার হতে হয় ততই মঙ্গল। তারপর এমন একটা দিন আসবে যখন তিতিবিরক্তি মনটা সংসার থেকে চিরতরে বিদায় নিতে বাধ্য হবে। সেজন্য একটু ধৈর্য্য আর একটু অপেক্ষার প্রয়োজন। কথায় আছে 'সবুরে মেওয়া ফলে।' আর যেদিন মেওয়া ফলবে সেদিনই হবে তাদের মনের ইচ্ছা পূরণ। অভিষ্ট সাধন। ঘটবে প্রাপ্তি যোগ। কারণ তাদের অবর্ত্তমানে তারাইতো 'উত্তরাধিকারী'।

সবার অলক্ষ্যে থেকেও অন্তর্যামী হাসলেন.....।

সুকুমার পাল
অবসর প্রাপ্ত কর্মী
শোনপুর-বাজারি এরিয়া, ইসিএল

# একই রকম

জানেন মেয়ের জন্য সম্বন্ধ খুঁজছিলাম,
খুঁজতে খুঁজতে সত্যি একটা বড়ো ভালো ছেলে পেলাম,
সময় হলো বিয়েও হলো, মেয়ে আমার শশুর বাড়িও গেলো,
কিন্তু টিকলো না বেশি দিন ওর জোড়া সংসার,
কেন না ওর মা ভাবলো -২,
কত ভালো হতো যদি হতো আমার মেয়ের একার সংসার,
শশুর নেই শাশুড়ি নেই, নেই কোনো ঝামেলা,
মেয়ে আমার ভাতঘুম থেকে উঠবে সেই সন্ধ্যাবেলা।
এই ভেবেই সে দিলো মেয়ের কানে - কানে কু - মন্ত্রণা,
তা মন্ত্র পেয়ে মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে -২,
বেশ কিছুদিন চললো ঝামেলা আর যন্ত্রনা,
শেষ-মেস জামাই আমার আলাদা হয়ে গেলো,
মেয়েও তার শ্বশুর শাশুড়ি কে এক ঝটকায় তাড়িয়ে দিলো ।
এখন দিব্বি আছে মেয়ে আমার,
যা পারছে তাই করছে,
আর টাইম টাইমে ভাত ঘুম দিচ্ছে।
এখন মেয়ের কথা শুনে মা তো বিরাট খুশি,
কিন্তু জানেন ওই খুশি টিকলো না আর বেশি,
ছেলের আমার বয়েস হয়েছিল, তার সম্বন্ধ দেখছিলাম,
এক অপরূপ সুন্দরী মেয়ে দেখে তার বিয়ে দিয়ে দিলাম,
জানেন বিয়ের কিছু দিন পরেই কি দারুন অনুভব না পেলাম -২
অনেক দিনেই হলো, আমরা মেয়ের কাছেই থাকতে চলে এলাম,
কেননা আমি, আমার বৌমাকেও ঠিক আমার মেয়ের মতনই পেলাম।

রঞ্জিত কুমার (আকেলা ভাটকেল )
সংসদীয় কার্য বিভাগ, ই সি এল সদর দফতর

# কবি স্মরণে

হে কবি আমাদের তখন জন্ম হয়নি
শুনেছি তোমার অনেক কথা
স্মৃতি বিজড়িত এই কারাগারের কক্ষে
একদিন তুমি ছিলে একা।
আজ তুমি দূরে বহুদূরে,
অন্তর আজও কাঁদে তোমার অগ্নিবীনার
সুর ও ঝঙ্কারে
আমরা সমবেত হয়েছি
তোমার শ্রদ্ধার্ঘ্য সাধনায়।
আজকে তুমি আমাদের হৃদয়ে হিমাদ্রীর মত
মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছ।
বয়ে চলেছো জীবন সত্য ও সুন্দরের ফল্গুধারার মত,
তোমার সৃষ্টি রহস্য আমাদের কাছে আজও শেষ হয়না
তুমি সব সময় চির নতুন চিরকালের
তোমার দুন্দভি, বাণী ও সুর
আমাদের হৃদয়ে বুলিয়ে দেয় শান্তির শুভ্র পরশ।
তুমি অনন্ত তুমি অসীম।
তোমার গীত বিতান সমস্ত প্রকার যন্ত্রনার
উপশমের টোটকা ।
তোমার কাণ্ডারী হুশিয়ার এই মিলনতীর্থে তুলেছে
নতুন জোয়ার
তোমার উন্মুক্ত কণ্ঠের গান, হিন্দু না মুসলিম
বৌদ্ধ না খ্রিস্টান
ভেদবুদ্ধির করেছিল অবসান ।
তুমি অনন্ত তুমি অসীম
আজও প্রানের টানে চেতনার টানে, শিল্প সাহিত্যর টান
তুমি সুন্দরের আশীর্বাদ
তোমার কবিতার বিদ্রোহ জেগে থাকে অহরহ
অসহায় মানুষের কান্নায়
তোমার প্রার্থনায় নতজানু হই, সমর্পিত হই
পরম বিশ্বাসে
তুমি মোর লহ প্রণাম।

**জয়ন্তিকা গড়াই**
অবসর প্রাপ্ত কর্মী,
সরদ দপ্তর, ইসিএল

# তাকিয়ে আছি

চাতক পাখিটা তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে
তাকিয়ে আছি আমিও
সে ভাবছে, বৃষ্টি আসবে কবে
আমি ভাবছি, ন্যায়-বিচারটা তাড়াতাড়ি শুনিও।

মাথায় কতটা চাপ দিলে
চোখ ফেটে বেরিয়ে আসে রক্ত!
না-না আমি নই কোন
রাজনৈতিক দলের ভক্ত।

শুধু একটা সাধারণ মানুষ হিসাবে ভাবছি
আর অন্তরটা ভয়ে কাঁপছে
সেই রাতে তার জায়গায় যদি থাকতাম আমি
তবে তো আমার শেষটাও এমন ভয়ানকই হত।

ভুলে একবারও 'বিচার চাই' কথাটা বলিনি
কেন জানো?
ঐ মুহূর্তটা কল্পনা করেই
বুকের রক্ত জল হয়ে গেল।

মুখ থেকে ভয়ে সরছেই না কথা
বলতে তো অনেক কিছুই চাইছি
নারীর দেহটাও পুরুষের মতনই একটা শরীর, একটা প্রাণ
যুগ-যুগ ধরে সবাই এটাই তো শুনে আসছি।

তবে সে যখন ব্যথায় আর্তনাদ করেছিল
তখন কেন শ্রোতাদের প্রাণ কাঁদল না?
ভুল হচ্ছে, অন্যায় করছি বুঝতে পেরে
একবারটিও থামল না।

কসাই যখন মাংস কাটে
তখনও সে এতটা নির্দয় হয় না
জীবকে সে একেবারেই হত্যা করে
তড়পে তড়পে জীবের প্রাণ যায় না।

তাকিয়ে আছি আর ভাবছি
কেমন করে দ্বি-পদী পশুগুলো এই কাণ্ডটা ঘটালো?
গলা দিয়ে নামছে তাদের খাবার?

যখন মর্মান্তিক দৃশ্যটা বারবার চোখের সামনে ভাসল!
ধর্ষণ তো কামনা-বাসনার অন্যায়রূপী প্রতিফলন
হিংসা তো তাকেও ছাপিয়ে যায়
নাহলে কেউ কী চায়
প্রিয় বান্ধবীর এমন বীভৎস মরণ !

ঘটনাটি হাসপাতালেই হোক
বা তোমার-আমার বাড়ির পিছনের গলিতে
সাবধানে থেকো মেয়েরা সব
পূজা-উৎসব বা হোলিতে।

মাকে আমি বলে রেখেছি
আমার সাথে ঘটলে এমন বিচার চাইতে যাবে না
খবরে আসবে বিকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিবরণ
গোপনীয়তা কিছুই আর থাকবে না।

অনুরোধ রইল পুত্রদের মায়ের কাছে
ছেলেকে সঠিক শিক্ষা দিন
কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখনও নয়
সত্য হোক এমন দিন।

তাকিয়ে আছি খবরের দিকে
উৎসুক হয়ে শুনছি
এইবার বুঝি বিচার হবে
তারই দিন গুনছি।

যাক গে, অনেক কথা বলে ফেলেছি
মনে কিছু রেখো না
কারোর নাম কিন্তু করিনি
এই কথাটি ভুলো না।

**নিবেদিতা দেওঘরিয়া**
করণিক গ্রেড -।
যান্ত্রিক এবং দূরসঞ্চার বিভাগ
ইসিএল সদর দপ্তর, সাঁকতোড়িয়া

# নারী

নারী বলে ফ্যালনা নাকি ; কোরোনা হ্যালাফ্যালা,
নারীর মধ্যেই আছে এমন শক্তি ; দুখীর দুখে হয় আত্মভোলা।
ত্রিভুবনের শক্তি ধরে সে হল শুধু নারী
স্বয়ং দেবতাদের ভরসাস্থল হল এই নারী,
স্বর্গচ্যুত দেবতারা যখন আসুরিক শক্তিতে হত,
নারী শক্তিই বাঁচিয়েছিলো ভুলোনা পুরানের কথা যত।
পুরুষ সমাজ চায় যে নারীকে শৃঙ্খল পায়ে গৃহবন্দী,
কিন্তু, বর্তমানের নারীর মানবে না যত সব বদ অভিসন্ধি ।
নয়তো নারী পিছিয়ে শিক্ষায়; নয়তো কর্মক্ষেত্রে,
পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যাচ্ছে রণক্ষেত্রে।
নারীর মধ্যে আছে সহ্য, ধৈর্য, দয়া, ক্ষমা ও কর্তব্যপরায়ন,
যে কেনো ক্ষেত্রে লড়াই করে রক্ষা করে জয়ীর আসন।

# মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন

"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন"
এই অমোঘ সত্য আজ বইয়ের লাইন গণ্ডিবদ্ধ।
নেই আজ তার প্রকাশ মানব মনের অন্তরে,
সততা, একতা, মানবতা আজ শুধুমাত্র হিংস্রতা,
বিচ্ছিন্নতা আর অবিচারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ।
মুকহীন হয়ে রয়েছে ন্যায় আর সাধুবাদ।
একদিন যে রবি কবির জ্ঞান ঐশ্বর্য নিয়ে
উদিত হয়েছিল সভ্যতার নব-রবির উষালগ্ন-
রবি কবির অস্তাচলের সাথে সাথে সেই ঐশ্বর্য, সভ্যতা
হয়েছে ধূলি লুণ্ঠিত আর অস্তমিত!
হে অতীত! তোমারই স্নেহের সুধাধারায় নবপ্রজন্ম ভূমিষ্ঠা,
নব শতাব্দীর আগমন ধ্বংস করুক এই অস্পৃশতার তমসা -
বন্ধহোক উভ শৃঙ্খল নগ্ন ব্যভিচারী তান্ডব।
মুছে যাক যত হিটলারী রক্তের পদচিহ্ন!
ধ্বংস করুক অন্যায় ভীরুতার কালের অমনিষা।
চিরতরে বিলীন হোক পৈশাঠিক অরাজকতার গরল মাখা উল্কাপাত।
বিসুভিয়াসের অগ্নুৎপাত শেষে উদিত হোক
নব-সভ্যতার সোনালী উষা।

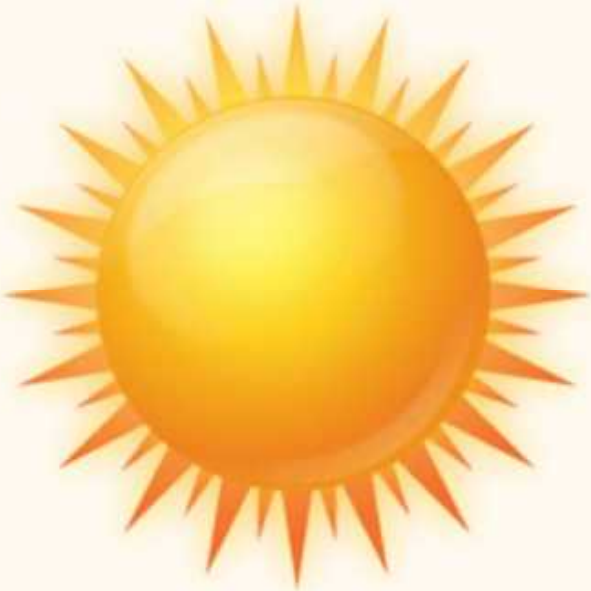

**বিশ্বরঞ্জন সরকার**
মাইনাস রেস্কুউ স্টেশন
সীতারামপুর, ইসিএল

# নিরুত্তর

রাত্রি কালো আঁধারে যেমন ছড়ায় জ্যোৎস্নার আলো।
প্রথম তোমায় দেখার পরে লেগেছিল আমার ভালো।।
একদিন তুমি বললে যখন বন্ধু এবার আসি।
তখন আমার মনে হলো আমি তোমায় ভালবাসি।।
বললাম আমি মনের কথা তোমায় ভালোবাসে।
করলে গ্রহণ এই নিবেদন মিষ্টি হাসি হেসে।।
তোমার কথা ভাবতে ভাবতে পাল্টে গেল স্বভাব।
আজো তো তুমি দিলে না কেন আমার প্রেমের জবাব।।
আজকে যেন আমার চোখে নিভলো আশার বাতি।
তোমার কথা জাগলে মনে কাটে না মোর রাতি।।
আজকে আমি পাইনা খুঁজে তোমার মনের কথা।
দেখলে আমায় বুঝবে তুমি আমার মর্ম ব্যথা।।
চায়না আমি মরতে আজি তোমায় একা রেখে।
এই জীবন কাটিয়ে দেবো তোমার মুখটি দেখে।।
আজকে আমার মনটি চায় তোমায় পেতে দেখা।
না পেয়ে আমি আজকে তোমায় হলাম বড়ো একা।।

রাজেন সাধু

# WIPS ই সি এল র উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস উদযাপন

ই সি এল র WIPS (Women in Public Sector) শাখার উদ্যোগে ৯ মার্চ আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস অত্যন্ত উৎসাহ ও মর্যাদার সঙ্গে উদযাপিত হয়। এ বছরের থিম ছিল তদান থেকে উপকারদ এবং বিশ্বব্যাপী বার্তা ছিল তঅধিকার-ন্যায়বিচার ও পদক্ষেপ সকল মহিলা ও কন্যাদের জন্যদ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ই সি এল এর অধ্যক্ষ তথা পরিচালন অধিকর্তা শ্রী সতীশ ঝা, শ্রীমতী কিরণ ঝা, নিদেশক (তকনিকী) শ্রী নীলাদ্রি রায়, শ্রীমতী সঞ্চিতা রায়, নিদেশক (মানব সংসাধন) শ্রী গুঞ্জন সিনহা এবং শ্রীমতী অনুভা সিনহা। তাঁদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি করে।

অনুষ্ঠানে শ্রীমতী সতীশ রায়ের একটি অনুপ্রেরণামূলক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি সুভাষচন্দ্র বসু স্কলারশিপ ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় কলকাতা সাইবার ক্রাইম সেলের উদ্যোগে সাইবার নিরাপত্তা ও সাইবার স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সচেতনতামূলক অধিবেশন আয়োজিত হয়।

এছাড়াও, ই সি এল র বিভিন্ন ক্ষেত্রের মহিলা কর্মীদের মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠানটিকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে, যা ভারতের বৈচিত্র্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সুন্দরভাবে তুলে ধরে।

এই আয়োজনটি মহিলাদের শক্তি, সাফল্য এবং অমূল্য অবদানের প্রতি এক অর্থবহ শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে প্রতিফলিত হয়। উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা WIPS ই সি এল র এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

# আমার কুম্ভ স্নান

ইচ্ছে হল হঠাৎ করে
স্নান করতে কুম্ভ যাব,
পাপ পুণ্যের হিসাব তো নয়,
শুধু মাত্র সাক্ষী হব।
বেরিয়ে গেলাম সাত সকালে
চিন্ময় আর অভিজিৎ কে সঙ্গে নিয়ে,
মাঝ রাস্তায় ভীষণ বিপদ
নেমে এল হঠাৎ করে,
কোন ক্রমে প্রাণে বাঁচলাম
ড্রাইভার ভাই এর বুদ্ধির জোরে।
কিন্তু গাড়ি বিকল হল,
যাওয়া কি মোদের পণ্ড হলো?
ভাগ্য মোদের সাথেই ছিল
তাই যাওয়াটা নিশ্চিত হল,
শুরু হল নুতন যাত্রা,
নুতন গাড়ি  নুতন চালক
ভয় তখনো যাইনি মোদের,
ঠিক যেন সব ছোট্ট বালক।
শনশনিয়ে ছুটছে গাড়ি,
দিতে হবে জলদি পাড়ি।
নেইকো সময় কোনও খাওয়ার
খুব ইচ্ছে মেলা ঘোরার।
পৌঁছে মোরা সবাই অবাক
কোটি মানুষ, লক্ষ গাড়ি,
সত্যি সত্যিই নির্বাক।
স্নান করলাম আমরা সবাই,
সঙ্গে ছিল গোটা দেশ,
কত মানুষ কত সাধু
কত রকম তাদের বেশ।
একটা ডুব, দুটো ডুব,
চিন্ময়ের সাথে প্রতিযোগিতায়
নাই নাই করে পাঁচটি ডুব।
নাকে মুখে জল ঢুকে
হল কত রঙ্গ,
অনেক কষ্টে স্নানের পর্ব,
হল মোদের সাঙ্গ।
কত দোকান নানান জিনিস,
কিনছে সবাই মনভরে,
হচ্ছে খুশি দোকানদার
পেয়ে ভবিষ্যতের রোজগার।
দেখতে পেলাম সমস্ত দেশ
সম্ভব হলো এই কুম্ভে,
ধর্ম কর্ম আমি বুঝিনা,
থাকবে মনে বহুদিন
এই ঘটনার রেশ।
বিরল অভিজ্ঞতার সাক্ষী থাকলাম,
শুনছো কি ওহে কুম্ভ?
তোমার কাছে ডেকে নিয়ে,
ভাঙলে  সবার দম্ভ।
ক্যামেরার তোলা ছবি গুলো সব
থাকবে WhatsApp আর Facebook এ
চোখের তোলা ছবি গুলো সব
থাকবে হৃদয়ের এককোন এ।

**সুদীপ চ্যাটার্জী**
প্রবন্ধক (মানব সংসাধন)
সোদপুর এরিয়া, ইসিএল

# পুণ্যভূমি কামারপুকুর জয়রামবাটী

হুগলি জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামের যে ভূমিতে জন্মগ্রহণ ক'রে পরবর্তীকালে সমগ্র বিশ্বের অগণিত ভক্তের কাছে একজন হয়ে উঠেছিলেন যুগপুরুষ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব; অন্যজন তাঁরই সহধর্মিনী অনতিদূরে বাঁকুড়া জেলার এক গ্রামে জন্ম নিয়ে হয়ে উঠেছেন জগন্মাতা শ্রী শ্রী মা সারদা-সেই দুই পুণ্যভূমি গ্রাম কামারপুকুর ও জয়রামবাটি ভ্রমণের ইচ্ছে ছিল বহুদিনের।

অবশেষে এক শনিবার বিকেলে সপরিবারে দুর্গাপুর থেকে ট্রেনে চেপে বেরিয়ে পড়লাম বর্ধমানের উদ্দেশ্যে। সেখানে বড়ো ভাইরাভাই-এর বাড়িতে রাত্রিযাপন করে পরদিন সকালে গাড়ী ভাড়া করে রওনা দিলাম কামারপুকুর-জয়রামবাটির উদ্দেশ্যে। বর্ধমান থেকে কামারপুকুরের দূরত্ব প্রায় পঞ্চাশ কিঃমিঃ; সময় লাগে ঘন্টা দেড়েক। পথে পড়ে দামোদর আর একলক্ষী নদী। দুপাশের সবুজ মাঠ-ঘাট দেখতে দেখতে সকাল ন'টায় পৌঁছে গেলাম পরম পুরুষ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের জন্মভূমি কামারপুকুরে। সেখান থেকে তিন কিলোমিটার দূরত্বে শ্রীশ্রী মা সারদার জন্মভূমি জয়রামবাটি। আমরা প্রথমেই গেলাম জয়রামবাটিতে সারদার স্মৃতিধন্য মাতৃমন্দিরে। প্রবেশদ্বারের ডান দিকে খড়ের ছাউনিঘেরা মাটির ঘর, যেটি মায়ের নতুন বাড়ি বলে পরিচিত। প্রবেশদ্বার পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলেই মন প্রশান্তিতে ভরে যায়। সামনেই সারদা মায়ের মন্দির। শ্রী মায়ের পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আদি বাস্তুভিটায় এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের বাইশে ডিসেম্বর যে স্থানে মা সারদা জন্ম গ্রহণ করেছিলেন সেখানেই তার একটি মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। এই ভিটেতেই শ্রী মায়ের বিবাহ হয়েছিল এবং তাঁর ন বছর বয়স পর্যন্ত এখানেই বাস করেছিলেন। প্রবেশদ্বারের বাঁদিকে একটু এগিয়ে গেলেই খড়ের ছাউনি দেওয়া মায়ের পুরাতন বাটি। পাশে অফিস ঘর। পুরাতন বাটিতে মা সারদা ১৮৬৩ থেকে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৫২ বছর বসবাস করেছিলেন। মন্দিরের উল্টোদিকে রয়েছে মা সারদার পিতৃপুরুষের কুলদেবতা সুন্দর নারায়ণ, ধর্ম ঠাকুর ও শীতলা মায়ের মন্দির। মাতৃমন্দিরের ভেতরে রয়েছে সুন্দর সাজানো বাগান, ভক্তদের জন্য অতিথি নিবাস সারদা ধাম, মায়ের পরিবারের একটি বড় পুকুর যেটি পুণ্যিপুকুর নামে পরিচিত। রয়েছে পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং প্রসাদ গ্রহণের জন্য একটি বড় প্রসাদ কক্ষ। দুপুরে প্রসাদ পাওয়ার জন্য সকাল নটা থেকে এগারোটার মধ্যে কুপন কাটতে হয়। একসাথে পাঁচশ মানুষকে বসিয়ে ভাত,ডাল, সব্জি, পায়েস সহযোগে প্রসাদ খাওয়ানোর সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে। আমরাও প্রসাদ খেলাম। খাওয়া হয়ে গেলে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়; পুনরায় সেটি বিকেল সাড়ে তিনটেয় খোলা হয়।

তাই এরপর আমরা চলে গেলাম পাঁচ কিঃমিঃ দূরে গড় মান্দারণে। মান্দারণ ছিল মুঘল আমলের বিখ্যাত স্থান। চারপাশের গ্রামগুলিকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য একটি দুর্গ নির্মাণ করা হয়। সেই দুর্গের ভেঙ্গে পড়া তোরণ, স্তুপ ও পরিখা এখনো বর্তমান। এই দুর্গটির কারণেই মান্দারণ গড় মান্দারণ নামে পরিচিত হয়। গড়ের উপরের স্থানটি গাছপালা ঘেরা, অত্যন্ত মনোরম। নীচে দামোদর নদ।

বিকেল চারটে মধ্যে আমরা আবার ফিরে এলাম কামারপুকুরে। এখানে রয়েছে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ মঠ। মঠে প্রবেশ করে এক অপার শান্তিতে মন ভরে গেল। মন্দিরে প্রবেশের পরেই ডান দিকে দেখলাম শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের স্বহস্তে লাগানো ১৬০ বছরের পুরনো আমগাছ। সেখানে থোকা, থোকা আম ঝুলছে;হাতের নাগালে, কিন্তু কেউ তাতে হাত দিচ্ছেন না। প্রত্যেক দর্শনার্থীকে পরিশ্রুত পানীয় জলের সরবত দেওয়া হচ্ছে। শরবত পান করে আমরা ডানদিকে এগিয়ে গেলাম। এখানে রয়েছে রামকৃষ্ণদেবের মন্দির। মন্দিরের ভেতরে তাঁর মুর্তি। এই স্থানে শ্রী শ্রী ঠাকুর জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। গদাধর এর (শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্য নাম) জন্ম হয়েছিল ঢেঁকি সালে। এই ঢেঁকি সালের উপরেই মন্দিরটি নির্মিত। একটু এগিয়ে গেলেই ঠাকুরের কুল দেবতা

রঘুবীর, শিব ও শীতলা মায়ের মন্দির। তার ডানদিকে ঠাকুরের শয়নকক্ষ। খড়ের ছাউনি, মাটির উঁচু দাওয়া। পাশে আরো একটি ঘর। সেখানে রামকৃষ্ণদেবের দাদা থাকতেন। মাঝে খিড়কি দরজা। এই জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে এক অপার বিস্ময় জাগে। এক অতি সাধারণ পরিবারে জন্ম নেওয়া মানুষ, যিনি সেভাবে পড়াশোনাও করেননি; আজ তাঁরই নামাঙ্কিত অসংখ্য রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন থেকে অগণিত মেধাবী ছাত্ররা পাশ করে বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত। যুক্তিবাদী, উচ্চশিক্ষিত স্বামী বিবেকানন্দ যাকে গুরু বলে গ্রহন করেছিলেন; সেই পরম পুরুষ, যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি ধরাধামে এই স্থানেই আবির্ভূত হয়েছিলেন! জীবনের প্রথম ১৮ টি বছর তিনি এই কামারপুকুর গ্রামে অতিবাহিত করেছেন। বিস্ময় কাটিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম। এরপর কামারপুকুর গ্রামে গদাধরের বিভিন্ন স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলি দেখতে বের হলাম। প্রথমেই পাইন দের বাড়ি যেখানে গদাধর শিবের অভিনয় করতে গিয়ে শিবভাবে সমাধিমগ্ন হয়েছিলেন। দেখলাম লাহাবাড়ির দুর্গা মন্দির ও বিষ্ণু মন্দির। কামারপুকুরের জমিদার ছিলেন ধর্মদাস লাহা, তার সঙ্গে রামকৃষ্ণ দেবের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের আত্মিক সম্বন্ধ ছিল। আরেক জমিদার সুখলাল গোস্বামীর সাথেও ছিল অভিন্ন মিত্রতা। ধর্মদাস লাহা ও সুখলাল গোস্বামীর ঐকান্তিক চেষ্টায় ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় সপরিবারে দেরিয়াপুর বা দেরেগ্রাম থেকে কামারপুকুর চলে আসেন ও বসবাস করেন। গদাধর এর উপনয়ন, অন্নপ্রাশন ও বিবাহে লাহা বাবুর বিশেষ ভূমিকা ছিল। বালক গদাধর লাহা বাবুদের দুর্গা প্রতিমার চোখ এঁকেছিলেন। দুর্গা মন্দিরের সামনেই পাঠশালা যেখানে গদাধর মাস্টারমশাই এর কাছে পড়তেন আর যোগ-বিয়োগ করতে দিলেই "বিয়োগ আমি পারিনে" বলে পাশের বিষ্ণুমন্দিরে চলে আসতেন। এরপর গেলাম ধনী কামারিনীর বাড়ি। রামকৃষ্ণদেবের জীবনে ধনী কামারিনীর এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ধাত্রী মা এবং ভিক্ষা মা। ঢেঁকি সালে জন্মের পর কামারকন্যা ধনী শ্রীরামকৃষ্ণের ধাত্রীর কাজ করেছিলেন এবং তিনিই প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের মুখদর্শন করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি রামকৃষ্ণের ভিক্ষা মা হয়েছিলেন। সেই ধনী কামারিনীর বাড়িতে এখন একটি মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে গদাধরকে কোলে নিয়ে ধনির একটি মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। মূর্তিটি নির্মাণ করেছেন বিখ্যাত ভাস্কর গোপেশ্বর পালের দৌহিত্র আশিস পাল। এরপর দেখলাম সেই পুকুরটি, যেটির নামে এই গ্রামের নাম হয়েছে কামারপুকুর। গড় মান্দারণের মাণিকরাজা কয়েকঘর কর্মকারকে এখানে এনে বসতি করিয়েছিলেন।তাদেরকে আনা হয়েছিল লোহার বিভিন্ন অস্ত্র ও কৃষিকাজের সরঞ্জাম তৈরি করানোর জন্য। তাদের বসতির পাশেই বন-জঙ্গল সাফ করিয়ে তাদেরকে দিয়ে একটি পুকুর খনন করানো হয়েছিল। কামারদের দ্বারা খনন করা পুকুর লোকমুখে কামারদের পুকুর নামে পরিচিত হয়। পরবর্তিকালে কামারদের পুকুর হয়ে যায় কামারপুকুর।

জনবসতিটিও কামারপুকুর নামে পরিচিতি পায়। সন্ধ্যের পর আমরা কামারপুকুরের বিখ্যাত সাদা বোঁদে আর জিলিপি যা রামকৃষ্ণ দেব খেতে খুব পছন্দ করতেন, তা খেয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

তথ্যঋণ ঃ

১। সৌভাগ্যবতী ধনী কামারিণী - দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
২। মাতৃমন্দির, রামকৃষ্ণ মঠ ও বিভিন্ন স্মৃতিবিজড়িত স্থানের ফলক সমূহ।

**স্বপন কুমার দাস**
টেকনিক্যাল ইন্সপেক্টর
কাজোড়া এরিয়া অফিস, ইসিএল

# বিকেলের পরাশকোল আবাসন

সূর্য ঢলে পড়ার সাথে সাথে
ঝিমিয়ে পড়েছে শিরিষ পাতা
পাখিদের কিচির মিচির ডাক
বাচ্চাদের ক্রিকেট ব্যাটে
চার-ছয়ের হাঁক।
কোলাবসিবেল গেট খোলার সাথে
টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন ভেসে আসে।
রাস্তায় চলে যায় শ্রমিক,
পিক আপ নেয় মোটর বাইক;
মুহূর্তে মৃদু হাওয়ায়
দুলে ওঠে ঝিমোন শিরিষ;
পাখিরা স্বর বদলে
দেয় অন্য শিস।

রাস্তার চলাচল শান্ত হয়ে যায়
হঠাৎই আকাশটা লাল আভা নিয়ে
স্বর্গীয় রূপ আঁকে ওসিপি-র চূড়ায়।
ঠিক এই মুহূর্তেই শুরু হয়
হোম মেকারদের বৈকালিক আড্ডা।
হালকা ফুরফুরে খুনসুটি মন
হাসি ঠাট্টায় মেতে ওঠে
আমাদের পরাশকোল আবাসন।

**অমলা দাস**
স্বামী - স্বপন কুমার দাস
টেকনিক্যাল ইন্সপেক্টর
কাজোড়া এরিয়া অফিস, ইসিএল

# সময়

সময় মানুষের হাতে বাধা থাকে
কিন্তু মানুষের কি তার মূল্যদেয়
তবে একদিন এই সময়ের মূল্য দিতে হবে
কথায় বলে সময়ের ফি,
কথাটা সর্ব সত্য ।
তবে একটা ধরে বসে থাকলে চলবেনা
কারণ এটাও সত্য যে
মানুষ সময়ের দাস ।
যেমন বিন্দু বিন্দু জলে গড়ে ওঠে সিন্ধু
ঠিক তেমনই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্ত
দিয়ে তৈরী হতে পারে অবকাশ
যা পৃথিবীর মানুষের কাম্য।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবকাশ কে কাজে লাগতে হবে
মানুষের বৃহৎ কর্মযন্ত্রে
যদিও মানুষ সময়ের হাতে বাধা
তবুও সময় নিজেই অগ্রসর হয়
কারো জন্য অপেক্ষা করে না
পিছিয়ে পড়ে মানুষ
পিছিয়ে পড়ে যন্ত্র ॥

দেবব্রত মালাকার (দেবু)
বিদ্যুৎ এবং যান্ত্রিক বিভাগ
মুগমা ক্ষেত্র, ইসিএল

# মাধুরীর স্মৃতিতে

স্বপ্ন নিয়ে বেঁধে ছিলাম
সুখের খেলা ঘর।
দিয়েছিলে প্রতিশ্রুতি,
থাকবে জীবন ভর,
কিন্তু তুমি চলে গেলে
আমায় রেখে একা,
আর হবে না দেখা জানি ,
ব্যথা বিধুর বক্ষ নিয়ে ,
বাঁচব কেমন করে,
একলা হলে দুনয়নে
বৃষ্টি ঝরে পড়ে।
বৃষ্টি তো নয় অশ্রুঝরে
হারিয়ে গেছে ভাষা
কেমন করে ভুলব তোমার
নিবিড় ভালবাসা
ভোলা কি যায় ও মাধুরী
তোমার মধুর হাসি
মিথ্যে কেন বলে ছিলে
তোমায় ভালবাসি !

মানিক লাল আচার্য
অবসর প্রাপ্ত কর্মী, ইসিএল

# বিদায়

মাননীয় শ্রী অগ্নিময় দাশগুপ্ত, শ্রী দেবাশীষ মুখার্জ্জী এবং আমার সহকর্মী সকলকে জানাই আমার আন্তরিক ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। আজ ৩১শে আগস্ট ২০২০ আমার কর্মজীবনের শেষ দিন। আজ এই বিদায়ের অনুষ্ঠানে মনটা অত্যন্ত ভারাক্রান্ত কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে, চোখে আসছে জল কারণ বিদায় মানেই বেদনা ব্যাথা। আজ বিষাদের সুর, বিসর্জনের বাজনা মনে বাজে বারে বারে। যাদের এতদিন দিয়েছি বিদায় মানসদা, স্বর্গীয় হিন্টুদা, মতিদা, শঙ্করদা, বিরেনদা, স্বর্গীয় বিক্রমদা, কমল বাবু, স্বর্গীয় নির্মল বাবু, তপন বাবু আজি অলক্ষ্যে এসে দাঁড়িয়েছে তারা এখন ঘড়িতে বৈকাল ৫টা, বিদায় হয়েছে দিনের ক্লান্ত সূর্যের তেজহীন আভার আবার আগামী নতুন দিনে রক্তিম সূর্য উঠবে তার তেজ নিয়ে। আমাদের এই চলমান জীবনের ক্ষেত্রে সেই একই খেলা। আগমন-প্রস্থান, সুখ-দুঃখ ঘৃণা, ভালবাসা appointment superannuation, আর সবই যেন একে অপরের পরিপূরক।

বিদায় কষ্টের, বিদায় দুঃখের, এই কারণে যে ৩৯ বছর ৬ মাস ২১ দিন একটা সম্পর্ক, এত দিনের মেলামেশা প্রতিটি অফিসের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া, প্রতিদিন আসা-যাওয়া এবার থেকে আমি বঞ্চিত হব। এত দিনের স্মৃতি যা মনের মনি কোঠায় আবদ্ধ হয়ে আছে, এত দিনের তিল তিল করে গড়ে ওঠা সম্পর্ক, একটু একটু করে ভুলতে থাকবো এবং আপনারও আমাকে ভুলতে থাকবেন, তাই এটা আমার কাছে কষ্টের এবং বেদনার।

এই বিদায় আবার আনন্দের কারণ এই বিদায়ের মাধ্যমে আমি খুঁজেনেব নতুন একটি দিগন্ত এই বিদায়ের মাধ্যমে হয়তো খুঁজে নেব আগামী দিনের সঠিক দিশা, তাই বিদায় আমাদের জীবনে অবিরাম গতিতে চলতে শেখায়। আমরা জানি life is journey but not a destination জীবন হচ্ছে একটা যাত্রার নাম। জীবন অবিরাম গতিতে চলতে শেখায়। জীবন থেমে থাকতে শেখায় না। জীবনে অবিরাম গতিতে বাঁধা অতিক্রম করে চলতে শেখায়। তাই বলা যায় life is not a bed of roses, it is full of duty and stern work. অর্থাৎ জীবন গোলাপের বিছানা নয়, এটা হচ্ছে কঠিন কর্তব্য এবং কঠিন পরিশ্রমের একটা সমাহারের নাম।

চাকরী জীবনে আমি খেলাধুলাই অনেক পুরস্কার পেয়েছি কিন্তু ২০১৮ সালে ৫ই নভেম্বর মাননীয় সিএমডি শ্রী প্রেম সাগর মিশ্র মহাশয় আমার হাতে তুলে দিলেন বেস্ট কর্মীর পুরস্কার যা আমার দীর্ঘ কর্ম জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার এবং এই পুরস্কার আমার এবং আমার পরিবারের গর্বের । আমার এই বিদায় লগ্নে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি মাতৃসমা ইসিএল র আরও আরও উন্নতি হোক।

বিদায় কথাটি অত্যন্ত করুন ও কষ্ট দায়ক হলেও এটা যে আনন্দের, এটা অফিস সেরা বন্দীর ছুটি তা বলার অবকাশ রাখেনা। বিদায়ের এই অনুষ্ঠানে, এই আবেগঘন মহুর্তে উপস্থিত সকলকে এবং আপনাদের পরিবারের সকলকে আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং ঈশ্বরের কাছে ইসিএলের সমস্ত শ্রমিক পরিবারের মঙ্গলময় জীবন কামনা করে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার।

**দিলীপ কুমার আচার্য্য**
অবসর প্রাপ্ত কর্মী,
সোদপুর এরিয়া অফিস, ইসিএল

# রস চুরি

রাত ন'টা বাজে। তিন তালির শব্দ আমার পড়ার ঘরের খিড়কীর দরজাতে। কাঞ্চু এসে গেছে অনেকক্ষন ধরে মনটা ছটফট করছে। আর তর সইছে না। যেন কত কালের অপেক্ষা! এক বছর বাদে ফের খেজুরের রস। এই এক বছর যেন এক বছর নয় কয়েক কোটি বছর এই শৈশবের মনের কাছে। ভগবান কেন যে চাই তা প্রতিদিন না পেলে বড় অসহনীয় কষ্ট।

বালিশটি সোজা করে আমার পড়ার চেয়ারে বসিয়ে দিলাম। হ্যারিকেনের আলোটি কম করলাম সামান্য। যাতে বাড়ির লোকজন ভাবে তাদের ছোট ভাইটি এখনো ভদ্র সভ্য ছেলের মতো মনোযোগ সহকারে পড়ছে। যদি মেজদা বুঝতে পারে আমি রস চুরি করতে গেছি তাহলে আর রক্ষে নেই, সাক্ষাৎ যমের দুয়ারে পাঠিয়ে দেবে। উঠনের নিমগাছে লাঙলের দড়ি দিয়ে হাত-পা বেঁধে পাঁচন দিয়ে পিটিয়ে।

বেড়িয়ে পড়লাম হৃদয়ের টানে, প্রানের স্বতস্ফুর্ত অনাবিল আনন্দের জোয়ারে মনের রঙিন ডানা মেলে শুক্লপক্ষের ধরণীর বুকে। উড়ে চলেছি আমরা দুজনে টাটু ঘোড়ার মতো পা চালিয়ে সেই সুদূর খেজুরের মাঠে। কৃষ্ণের গোপিনীদের মতো আকর্ষণ এই শীতের রসের। এ টান উপেক্ষা করা সধ্যাতীত। শীতের প্রকৃতি মায়ের স্তন্যদুগ্ধের স্বাদ বড় মায়াবী, শরীর ও মনের পক্ষে সুখকর।

শুক্লপক্ষের মাঝামাঝি মৃদু জ্যোৎস্না আধফালি চাঁদ উঠেছে গৌতমদের আম বাগানের মাথার উপর। জোনাকির আলো, নক্ষত্রের আলো, সুদূর গ্রামের গৃহস্থ বাড়ির লন্ঠন ও হ্যারিকেনের আলোর বাহারে বড় মায়াবী প্রানোজ্জ্বল এই রাত শৈশবের এই মিষ্টি স্মৃতি সারা জীবনের পাথেয়!

বাড়ির সামনে সোজা রাস্তা ছেড়ে আমার দুজনে লালুদের বাড়ির পিছনের আম বাগানের মধ্য দিয়ে ভোলা খুড়োর বিলের রাস্তা ধরলাম আমবাগনের হলুদ, ওল-কচু-ঘ্যাটকল গাছের অন্তিম জীবনের শীর্ণদেহ লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। আমাদের দু জোড়া পা তার উপর দিয়ে চলেছে-বেশ নরম, আরামদায়ক। আমবাগনে, চাষের ক্ষেতে অত সাপ বা কীটের ভয় নেই। সর্বদা মানুষের চলাচল, তাই মন দুটি ফুরফুরে খোস মেজাজে অতীতের চুরির স্মৃতির রোমন্থন করতে করতে আমরা দুটি

প্রাণী এ নিঃশব্দ রাতে চলেছি। গ্রামের মানুষ সব শুয়ে পড়েছে। শীতকালে তারা সমস্ত গৃহকাজ তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করে শুয়ে পড়ে ।

মৃদু জ্যোৎস্না আর কার্তিকের অল্প শীতের উত্তরের বাতাস জোরানো কচি কচি গা সমূহ মটর ক্ষেত সবুজের সমুদ্র উথাল পাতাল ঢেউ খেলছে তার উপর, কি অপূর্ব এ মন হরনকারী ভুবন! সরষের ক্ষেতে সবে হলুদ ফুল এসেছে। মৃদু জ্যোৎস্নার আলোতে হলুদ রঙ যেন হলুদ পরী, ডানা মেলে আঁকা বাঁকা পথে উড়ে চলেছে উত্তর থেকে দক্ষিনে বাতাসের তালে তালে, হৃদয় থেমে যায় এই নয়না ভিরাম পাটভূমিতে! বিধাতার কি অপূর্ব সৃষ্টি! এমন শৈশব পাওয়া জীবনের কত সাধনের ফল। চুরি করার সময় এই অপার্থিব দৃশ্য আমার শিশু মনটিকে চুরি করে নেয়। মনের মধ্যে অনেক অগছালো ভাবনা আসে। তাই মাঝে মাঝে কাঞ্চু কি বলে আমি শুনতে পাই না। সে খুব রাগ করে আমার উপর। এই সব পটভূমির অপার্থিব, নৈসর্গিক দৃশ্য সম্পর্কে সে একদম ওয়াকিবহাল না, তার যত আনন্দ শুধু চুরি করা বস্তুর মধ্যে চুরিতে আমার ও ষোলো আনা আনন্দ আর এই মধুময় পটভূমি তো উপরি পাওনা ।

হালকা শীতের আমেজ বাতাসে। হাঁটা হাঁটি আর দৌড়াদৌড়িতে গরম লেগেগেছে গায়ে গামছা, পরণে হাফ প্যান্ট, খালি পা এই আমাদের সম্বল চুরির জন্য, চটি জুতো পড়িনা। ধরা পড়ার ভয় থাকলে পালাতে অসুবিধা হয় বা চটি জুতো দেখে আমাদের চিনে ফেলতে পারে ভবিষ্যতে লোকজনের কাছে খবর পেয়ে। গামছাটা আমাদের জীবনের রক্ষার প্রধান চাবিকাঠি। গামছার বুনন আলগা, তাই মুখ ঢেকে পালাতে সুবিধা দেখতেও কোন প্রকার অসুবিধা হয়না। এক ভাগ দিয়ে মুখ ঢেকে এবং অন্য ভাগে চুরি করা সামগ্রী বেঁধে নিয়ে আসা যায়।

কার্তিকের নবান্নের ধান উঠবে আর কিছুদিন বাদে। ধানের বিলে সোনা ঝরছে। জ্যোৎস্নার আলোতে আধপাকা ধানের ক্ষেত যেন সোনার স্বর্গপুরী, কোন এক সুন্দরি অপ্সরা স্বর্ণ অলংকরে সজ্জিত হয়ে আলু থালু সোনালী কেশে দুলতে দুলতে চলেছে কার্তিকের হিম শীতল বাতাসের তালে তালে।

আমরা দীপুদের খেজুরের বাগানের পশ্চিম দিকে উঁচু ঢিপিটার কাছে এলাম। প্রথম জিরান কাঠের খেজুরের রসের গন্ধে মাঠ খানি মৌ মৌ করছে, হৃদয়ে মরমে পশিল গো এ ঘ্রাণ। আমি কাঞ্চু এই ঢিপির ঢালে বসা যাক। চারিপাশে নজর দে ভালো করে দেখে শুনে নিতে হবে। ধরা পড়লে সর্বনাশ। দীপু আমাদের বন্ধু। স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। চোর চোর বলে সবাই ক্ষেপাবে। আর মেজদার সেই প্রহার খখ কাঞ্চু। "ঠিক আছে, যদি ধরা পরি....."।

কাঞ্চু খুব ভয়ার্ত মাঝে মাঝে ওর কথা শুনে আমার মাথা এই শীতেও গরম হয়ে যায়।

আমি ধমকের সুরে বললাম "তোকে আর নিয়ে আসবো না, গিরিকে দলে নেবো। এতো দিন চুরি করেও তোর সাহস হলোনা আর হবেও না"

কাঞ্চু "আর বলবো না ভুল হয়ে গেছে"। ভর্য়াত কণ্ঠে সে বললো সে সাধারণত বেশী তর্ক বিতর্ক করেনা আমার সাথে যদি তাকে দলত্যাগ করে অন্যকে দলে নিই, এই ভয়ে ।

শ্যেন দৃষ্টিতে চারিপাশটা দেখছি দু'জনে, মাঠ আর মাঠ, মটর, সর্ষে, সিম, বেগুন, তিল, ধানআরো কত কি। খেজুর, আম কাঠাল, লিচু, কলা গাছের বাগান আর বাগান –

আমি আজকের প্লান বলছি মনদিয়ে শোন। আজ তোর নাম খোকা, আমার নাম পোকা। তুই উত্তর দিকের হেলানো ছোট গাছটাতে উঠবি, যাতে লাফ দিয়ে পালাতে পারিস, পাশের মটর ক্ষেতের মাটি নরম-কলুরা সেচের জল দিয়েছে কালকে। তুই রাধাকাণ্ডদের সর্ষে ক্ষেতের আল ধরে দৌড়ে তুরুখ খালের সাঁকোর তলতে লুকাবি। আর আমি নন্দদের পানের বর জের মধ্য দিয়ে সোজা সাঁকোর তলায় ঢুকবো। তার পর ভালো করে ভেবেচিন্তে বাড়ি। এই রাত্রে কেউ সাঁকোর

কাছে যেতে সাহস করবেনা, স্বয়ং যমদূত, ও না। বুঝলি হাবা কোথাকার? আমি ঈশান কোণের গাছটাতে উঠছি। তাহলে গাছ দুটির মধ্য বেশ খানিকটা ফাঁকা। কাঞ্চু ভয়ে ভয়ে চাপা গলায় তুরুখ খালের সাঁকোতে এই রাতে আমি একা .... ওরে বাবারে ..... মরে যাবো ধনে প্রাণে .... পোকা আমি ধমক দিয়ে, "তোর আগে আমি পৌঁছে যাবো ক্ষণ গাধা কোথাকার ভীতুর ডিম, মাছ খাবো, জলে নামবো না। চুরি করবো আবার ভয়ে মরবো, চোরের আবার ভয় কীসের? মনে লজ্জা ঘৃণা ভয় থাকলে চোর হওয়া যায় না। বেশ শেষের সাথে ঝাঁঝ মিশিয়ে বললাম। যাতে ভয়ে ভয়ে ওর ভয় ক্ষয় হয়। প্রতিবার চুরি আগে আমাদের দুজনের নতুন নাম করন করি। যে নাম তল্লাটে কারোর নেই। ঐ নামেই কেবল দুজনকে ডাকি। চুরি শেষ হওয়া মাত্রই ঐ নামের মৃত্যু হয়। কঞ্চু কে যতই আমি ধমক দিই না কেন, মনে আমি ভীষণ দুর্বল ওর প্রতি। কেন জানি না। চুরি করার আগের ওর ভয়ার্তরুপটা বেশ উপভোগ করি এবং আমি বীরের মতো ওকে চালনা করি। আমি "খোকা"! বেশ উৎসুক, ভয়ার্ত কণ্ঠে কাঞ্চুর দিকে মুখ করে চেঁচিয়ে উঠলাম।

কাঞ্চু আমার গলার স্বর শুনে চমকে উঠে "কি হলো"?

আমি "ঐ দ্যাখ ভোলাদের সর্ষে ক্ষেতের মধ্যে মিটমিট করে টর্চের আলো জ্বলছে আর নিভছে মনে হচ্ছে কেউ পাহাড়া দিচ্ছে অথবা ওরা অন্য একদল আমাদের মতোই রস চোর"।

কাঞ্চু সর্বনাশ! আজকে এতো কষ্ট করে এসেও কপাল খারাপ –

আমি 'চুপ কর তো এসেছি যখন খেয়ে যাবো, কারো সাধ্যি নেই এই পোকাকে ধরবে, হরিণের মতো ছুটি কি সাধে। রোজ দুবেলা করে দৌড় প্রাকটিস করি। জেলাতে খেলে এসেছি, ঐ দীপু আর ওর বাবা আমাকে কি করবে। শোন তবে। ওরা যদি প্রথম তোকে ধরার চেষ্টা করে, আমি মুখে আওয়াজ করবো। তখন ওরা আমার দিকে এগানোর চেষ্টা করবে। আর ঐ সময়ের মধ্যে তুই লাফ দিয়ে যে পথে বললাম ঐ দিকে পালাবি। আমার দিকে আসবি না, আমি কখনোই তোকে বিপদে ফেলে একা যাবো না বাড়িতে, তোর কোন ভয়নেই আমার জীবন থাকতে, আমার কথা শুনে কাঞ্চু বেশ মনোবল ফিরে পেল।' মরুভূমির গাছের শিকড়ে সামান্য জলের উপস্থিতি হলে যা হয়, কাঞ্চু মনে মনে বললো এই না হলে দলনেতা। দলনেতার সাহসীকতা মানেই তো দলের সবার সাহসীকতা তার অসাড় হাত পা তে আবার শক্তির সঞ্চার হলো। সে মনে মনে ভাবলো পানের বরজ মানে ভুল্‌ভুলাইয়া। প্যাকাটির বড় বড় মাচা, ভিতরে অন্ধকার খোপ খোপ কুঠুর সাক্ষাৎ যমপুরী, নরক! যমদূর্ত ও ভয় পাবে ওখানে যেতে। পোকারসাহস আছে বলতে হয়। তার উপর সাপের বড় উপদ্রব এবং খ্যাক শিয়ালের বাসা।

আমি প্রথমে গিয়ে ঈশান কোনের গাছে চড়ে প্যাকাটির নল দিয়ে রস খাচ্ছি আর শ্যেন দৃষ্টিতে ওদের উপর নজর রাখছি। ওদের নড়াচড়া সব আমার দিকে। সর্ষের ক্ষেতের আলদিয়ে গুটি গুটি পায়ে সরীসৃপের মতো আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। মাঝের মধ্যে টর্চের মৃদু আলোর ঝলকানি। কাঞ্চু যেন সব ভয় ভুলে গেছে, সেও উত্তর দিকের গাছে চেপেছে। দুজনে কার্তিকের জিরান কাটের রসের স্বাদে ভয় কি জিনিস ভুলে গেছি। সমস্ত ভয় যেন কর্পুরের মতো উবে গেছে এক নিমিষে। ধরা পরি পরবো মার খেতে হয় খাবো মান সম্মান যায় যাবে কিছুই পরোয়া করিনা, এখন শুধুই রস খাবার সময়। রসই একমাত্র আমাদের জীবন অর্জুনের মত মাছের চোখ। মন প্রাণ ভরে খাবো, কিসের ভয়? মালিকের? সাপের? কীটের? ধূর তেরি। ভয় বলে কিছুই নেই। কার্তিকের জিরান কাঠের রসের এমন মায়াবী স্বাদ যেন নেশা, ভয়মুক্ত শুধুই অনাবিল আনন্দ।

দীপুর বাবা হটাৎ পাঁচ ব্যাটারীর টর্চ জ্বেলে কাঞ্চুর গাছের নিচে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠলো নাম শালা, আজ তোকে কেটে ফেলবো, এতো দিন পর আজকে ধরতে পেরেছি। এই হাড় কাঁপানো শীতে কত কষ্ট করে গাছ কাটি তা জানিস শালা? নাম আজকে দেখাচ্ছি মজা, নাম শালা। হাড়গোড় সব ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব। ছাল চামড়া ছাড়িয়ে নেবো। বদমাশ, হারামজাদা .....।

ওনার হাতে বড় বাঁশের লাঠি। কাঞ্চুর হাত পা হিম, হৃৎপিণ্ড অচল, শ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম, এই শীতে ও আর গাছকে জড়িয়ে রাখতে পারছে না। অঙ্গ প্রতঙ্গ এমন কি সমস্ত শরীর কচ্ছপের মত আড়ষ্ট হয়ে ভিতরের দিকে খিঁচে আসছে। বোধহয় পড়ে যাবে গাছ থেকে। বার বার সে মনে মনে ঠাকুরের জপ করছে এবার বাঁচিয়ে দাও ঠাকুর – আর নয় ঠাকুর – কান মলছি আর চুরি করবো না, হে পাগলা শিব তোমার কাছে মানত্ করছি চাল কলা, বাতাসা দেব, বাঁচিয়ে দাও ঠাকুর। ওরে পোকা বাঁচা, মরে গেলাম। তুই আমার ঠাকুর। আমার বুক দুরু দুরু করছে । মাথা ঘুরছে, চোখে সর্ষে ফুল দেখছি।

দীপুর এদিক ওদিক টর্চ মারছে, ওর বাবা কাঞ্চু নামছে না দেখে গাছে ওঠার উপক্রম করছে । রস খাবার আনন্দে ওদের গতিবিধির উপর নজর রাখতে একদম ভুলে গেছি। ভাবগতিতে, পরিস্থিতি খারাপ দেখে আমিও মুখে আওয়াজ দিলাম ।

দীপু ভেঙিয়ে বলছে ঠাকুর বাঁচাও আমার বুক দুরুদুরু করছে মাথা ঘুরছে .....

ওর বাবা গগনভেদি চিৎকার করে কোনো ঠাকুর আল্লা আজ তোকে বাঁচতে পারবেনা । তোর মাথা ঘোরা, বুক দুরুদুরু করা জীবনের মতো থেমে যাবে। নাম শালা । আমার আওয়াজ শুনে দীপু টর্চ মারতে লাগলো আমার দিকে আমি ভাড়ের মুখে মুখ লুকিয়ে গামছা দিয়ে চোখ বাদে মাথা মুখ ঢেকে লক্ষ্য রাখছি ।

দীপু ও বাবা ঐ আর একজন। ঐ গাছে বাবা নেমে পালানোর চেষ্টা করছে। শিগগির বাবা এসো। পালিয়ে গেল .... ।

ওর বাবা কি করবে না ভেবে পেয়ে আমার গাছের দিকে দৌড়াতে শুরু করেছে । যেই দুই গাছের মাঝামাঝি এসেছে আমি চিৎকার করে আওয়াজ করলাম ''খোকা লাফ দিয়ে পালা ।'' কাঞ্চু উত্তর দিলো ;;ঠিক আছে পোকা তুই ও পালা ।''

দুজনেই ঠাকুরের নাম করে ভয়ার্ত চিতা বাঘের মতো দিলাম লাফ । সেচের জলে ভিজানো মটর ক্ষেতের নরম মাটি, বেশ আরাম লাগলো। তার পর দুজনে দুদিকে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আহত চিতার মতো নক্ষত্র বেগে উধাও ।

ওদের কাছে একটিই মাত্র টর্চ লাইট। ছেলে ছোট বাবা হিসাবে ছেলে এই রাত্রে গাছ তলায় রেখে আমাদের ধাওয়া করবে কি না ভাবতে ভাবতে আমরা সাঁকোতে পৌঁছে গেছি। ওর বাবা কিছুটা আমার দিকে ধাওয়া করলো । দীপুও পিছে পিছে দৌড়াচ্ছে। দীপু টর্চ মারছে আর ওর বাবা চিৎকার করতে করতে ছুটছে। হটাৎ ওর বাবা পানের বরজের কাছে পুকুরে পড়ে গেল। এই কার্তিকের হিম শীতল ঠান্ডা জলে পরে কাঁপতে কাঁপতে অসাড় কণ্ঠে আমাদের প্রতি গালি গালাজ করে চলেছে .....।

দুজনে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলাম ''ঠাকুর ওদের অত কষ্ট দিও না। আমরা যে সৎচোর, সে ওরা বোঝেনা । তোমার এ প্রকৃতি আমাদেরই তো আর এক মা । এই শৈশবে মায়ের কোলে সামান্য দুষ্টমী করি মাত্র । মাত্র তো এক আধা গ্লাস রস খাই তাও ওদের চক্ষুশূল ! মার্জনা করো ঠাকুর ! হে অন্তর্যামী !

পরদিন সকালে দীপুর বাবা আমাদের বাড়িতে এসে বাবার কাছে জিজ্ঞাসা করছে ''আপনাদের গ্রামে 'পোকা' বা 'খোকা' নামে কারোর ছেলে আছে নাকি ?'' গতকালের সমস্ত ঘটনা বাবাকে নালিশ করছে। আমি পড়ার ঘরে বই পড়ার ভান করে মনে মনে হেসে চলেছি অস্ফুট হাসি ..... ।

ডাঃ প্রকাশ হালদার
মনোরোগ বিশেষজ্ঞ
সাঁকতোড়িয়া হাসপাতাল, ইসিএল, সদর দপ্তর

# সাঁঝের কানাই

গীতা জ্ঞান লয়ে কতকাল
রাই ফিরিব জগৎ মাঝে
যমুনা নাই, নাই বৃন্দাবন
রাই'বিনা দ্বারকা কী কাজে !

না জানি আরও কতকাল
কাটিবে প্রেমহীন দীন সাজে,
গোকুল বিনে বংশী বিনে
সুদর্শনে কি মন মজে!

পূর্ব জনমে সীতা'র সনে
রাজসুখ ভাগ্যে নাহি সহে,
বনবাসে কাটিল কাল
সমর সংঘর্ষ আবহে।

গোপালে মজিয়া গোকুল
স্বয়ং ঈশ্বর সাজায় তারে
অধর্মের বিনাশের আশে
পূজিল ভক্তিসম্ভারে।

জন্মের শুরুতে লেখা যার
ললাটে মৃত্যুর শমন ভার
সেই কৃষ্ণরে সঁপিল জগৎ
রাজা কংসের সংহারভার !

না রইলাম দেবকীর কৃষ্ণ
না হইলাম যশোদার গোপাল।
না আমি আজ রাধা'র কানু
না থাকিলাম ব্রজের রাখাল।

সমর সাম্রাজ্যের ধূম্রজাল
সন্ধি সংঘাত আর বৈরিতা
মেকি অধর্মের বিনাশে
ধর্মযুদ্ধের দ্বিচারিতা।

ভ্রাতৃঘাতী কুরুক্ষেত্র
নিষ্ফল লাগিছে যেন আজ
স্বজন বিয়োগ অভিশাপ ভার
সদাই দহিছে হৃদয় মাঝ।

জগতের পাপ শিরে লয়ে
বড় ক্লান্ত ব্রজের কানাই,
জীবন সাজায় সাঁঝের বেলায়
কি মুখ দেখাই তোমারে রাই।

**শ্রীঅচিন্ত্য সেনগুপ্ত**
অবসর প্রাপ্তকর্মী
সদর দপ্তর, ইসিএল

# হৃদয় ভরা সোনা

তুই তখন খুব-ই ছোট
আমার হাতটি ধরে
পা পা করে
অনেকটা পথ দিলি পাড়ি
আমার মনে খুশীর আলো
চোখে মুখে তারি ঝলক
সোনা আজ পায়ে হাঁটলো
দিন পেরোলো মাস পেরোলো
বড় হলি
যৌবন এলো –

একদিন আমার চোখে তোর ছিল দেখা
চিনে ছিলি এক এক করে
প্রকৃতি পাহাড়
জীব জন্তু
পশু পাখি
কীট পতঙ্গ
গাছ পালা
সব সব –

আমার বয়স পাকলো
তোর আচার আচরণে অসঙ্গতি পড়ল ধরা
প্রশ্ন করলাম সহজ ভাবে
সহজ প্রশ্নের কঠিন উত্তর
বুকের মাঝে পাহাড় ভাঙ্গা ঝড় উঠল
মনটা ভেঙ্গে হোল খান খান –

সেই ছোট্ট বেলার কথা গুলো খুব খুব পড়ছিল মনে,
তোর প্রথম জ্বরের দিন আমি পাগল পারা
সারা রাত চাদর মুড়ি দিয়ে জেগে ছিলাম কোলে নিয়ে,
দু হাত দিয়ে করেছি তোরে লালন পালন
তুই যে আমার হৃদয় ভরা
ছোট্ট সোনা ।

এইতো সেদিনেরি কথা
তোকে হষ্টেলে দিয়ে এসে
শীতের রাতে
সারা রাত পায়চারি করেছি
খোলা বারান্দায়
আর
ফিরে গেছি তোর ঘরে
বার বার চোখ পড়েছে
তোর ছবির দিকে
প্রথম জন্মদিনের ছবি ।

বলতে পারিস কি অভাব রেখেছিলাম
কোথাও কি ছিল অভাব তোকে মানুষ করার,
ভুলে গেলি সকল বন্ধন
শুধু রেখে গেলি যন্ত্রনা।

তুই ছিলি আমার হৃদয় ভরা সোনা
আমি কি হতে পেরেছিলাম তোর –
যেখানেই থাক ভাল থাক
তুই যে আমার হৃদয় ভরা সোনা।।

**পার্থ চৌধুরী**
সোনপুর বাজারী প্রজেক্ট
ড্রিল সেকশন, ইসিএল

# চিত্রকলা

**মান্যতা মণ্ডল**
লরেটো কনভেণ্ট, আসানসোল
পিতা - ধরম মণ্ডল
নির্দেশক (তকনিকী) যোজনা
এবং পরিযোজনা সচিবালয়
ইসিএল, সদর দপ্তর

**লগ্নজিতা শর্মা**
লরেটো কনভেণ্ট, আসানসোল
ক্লাস - ।
পিতা - সুজিত শর্মা
ইসিএল, সদর দপ্তর

# চিত্রকলা

**অহনা রায়**
গ্রীন পয়েন্ট একাডেমী
ক্লাস - II
মা - স্বাগতা রায়
ভূ-রাজস্ব বিভাগ
ই সি এল, সদর দপ্তর

**শ্রেয়া সিং**
মহিলা কল্যাণ
ক্লাস - VII
মা - প্রীতি সিং
ভূ-রাজস্ব বিভাগ
ই সি এল, সদর দপ্তর

# মৃদঙ্গার

# मृदंगार

## गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा

আমার শক্তিতে পৃথিবীতে প্রবেশ করে আমি সকল জীবের অধিকারী।

अपनी शक्ति के साथ पृथ्वी में प्रविष्ट होकर, मैं सब जीवों को धारण करता हूँ।

Entering the earth by my power, I possess all living beings.

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (অধ্যায়-১৫, শ্লোক-১৩)

श्रीमद्भागवत्गीता (अध्याय-१५, श्लोक-१३)

Ridge